পিতৃপুরুষ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

পিতৃপিতামহের চরণে

পিতৃপুরুষ

ঝড় যখন আমাদের গ্রামের উপরে এসে আছড়ে পড়ে, রাত তখনও ঘোর হয়নি। উত্তরের বাড়ির জ্যাঠামশাইয়ের আজ হিজলকান্দার হাটে যাবার কথা ছিল। তিনি গেলেন না। এক হাতে জুতো ও অন্য হাতে ছাতা নিয়ে, বুড়ো কামলা উপীন্দরদার মাথায় মস্ত একটা ধামা চাপিয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আর এগোলেন না, পালান থেকেই ফিরে এলেন। আইনদ্দী-কাকাও তার ভাগ-রাখালির গোরুগুলোকে দক্ষিণের ভিটে থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এগোতে-এগোতে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল, "আইজ্জ আর কেউ বাড়ির থন্ বাইরাইয়েন না, বুড়াকর্তা।• তুফান ওঠ্‌ফার পারে।"

ঠাকুমাও সেই বিকেল বেলাতেই আঁচ করেছিলেন যে, একটা-কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সদরের উঠোনে একবার চক্কর দিয়ে এসে, দাওয়ায়-শুকোতে-দেওয়া আমসত্ত্ব আর ডালের বড়িব কুলো ডালা ইত্যাদি সব গুছিয়ে তুলতে তুলতে, হঠাৎ একবার বাঁ হাত কপালে তুলে পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ্দুর আড়াল করে, বাড়ির উত্তর দিকের চিনিটোরা আমগাছটার মাথার দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন ; তারপর বড়-কাকীমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "গতিক আমার সুবিধার ঠ্যাকে না, মাইঝা-বউমা। আকাশের সাজগোজডা একবার দ্যাখছ? গাছগুলাও কেমন দম ধইরা রইছে, আগার পাতাডা পর্যন্ত নড়ে না, মা বসুমতী আইজ্জ এট্টা কাণ্ড ঘটাইয়া ছাড়বেন। তুমি আর দেরি কইরো না, রান্নাবাড়ির কাজকর্ম তাড়াতাড়ি চুকাইয়া ফেলাও, তারপর থালাবাসন লইয়া, রান্নাঘরে শিকল টাইনা, বড় ঘরে আইসা ওঠো।"

সন্ধ্যার খানিক বাদেই উঠল ঝড়। গাছপালা, বাড়িঘর, খাটপালঙ্ক ইত্যাদি সমস্ত-কিছু একটা ভীষণ ধাক্কায় হঠাৎ দুলে উঠল। বড়-কাকীমার রান্নাবান্না তার খানিক আগেই শেষ হয়েছিল ; হাঁড়ি কড়াই আর থালাবাসনও রান্নাঘর থেকে আমাদের শোবার ঘরে চালান হয়েছিল ইতিমধ্যে। বাকী ছিল খানকয় কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি। তিনি তখন এক-হাতে একখানা বিরাট পিঁড়ি ও অন্য-হাতে লণ্ঠন নিয়ে, অন্দরের উঠোন পেরিয়ে, বড়-ঘরের দিকে আসছিলেন। ঠাকুমার আহ্নিক সবে শেষ হয়েছে। ঠাকুর্দা ও-সব সন্ধ্যা-আহ্নিকের বাড়াবাড়িতে বিশ্বাস করেন না; খাটে বসে, তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে, গড়গড়ার নলটিকে কায়দা করে বাগিয়ে ধরে, মিঠে-কড়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাকে তিনি তাঁর বাল্য-ও-যৌবনবয়সে-দেখা কলকাতার গল্প শোনাচ্ছিলেন। পুজোর সময় কৈলাস বসুর বাড়িতে মস্ত বড় যাত্রার আসর বসত। খুব ধুম হতো। ঠাকুমা নাকি একবার সেই যাত্রা দেখতে গিয়ে হারিয়ে যান; তারপর মেয়েদের ভিড়ের ভিতর থেকে ঠাকুর্দা আবার অনেক কষ্টে তাঁকে খুঁজে বার করেন। সেই গল্প

শুনতে শুনতে, হঠাৎ একবার পিছন ফিরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে, বড়-কাকীমার লণ্ঠনের আলোয় আমি দেখতে পাই যে, রান্নাঘরের টিনের চালা—স্ক্রু ও পেরেকের বাঁধন থেকে কড়-কড় শব্দে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে—ভীষণ বেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, পশ্চিমের বড়-পুকুরের দিকে উড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে সেটা অন্ধকারে, চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল। হাওয়ার ঝাপ্টায় দপ করে একবার চতুর্গুণ জ্বলে উঠেই নিবে গেল লণ্ঠনের আলো। বড়-কাকীমা বারান্দার উপরে এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ঠাকুমা তক্ষুনি ছুটে গিয়ে "ও চারুবালা, ও চারুবালা" বলতে বলতে তাঁকে জাপটে ধরে ঘরের মধ্যে টেনে আনলেন; জালার মধ্যে ঘটি ডুবিয়ে জল নিয়ে এসে তাঁর চোখেমুখে ঝাপ্টা দিতে লাগলেন। খাট থেকে নেমে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, ঠাকুর্দা চেঁচাতে লাগলেন, "জাগীরদার! জাগীরদার!" তারপর সদর-উঠোনের ওদিক থেকে জাগীরদার সিংয়ের সাড়া মিলতেই : "কোথায় থাকিস হারামজাদা? শিগগির গোয়ালঘরে যা, গাই-বাছুরের দড়ি কেটে দে, নয়ত চালের তলায় চাপা পড়বে।"

হাওয়ার বেগ ইতিমধ্যে ধাপে-ধাপে চড়ে যাচ্ছিল। সারাক্ষণ একটা গোঁ-গোঁ শব্দ লেগে আছে। তারই মধ্যে দম্‌কা এক-একটা ঝোড়ো হাওয়া এক-একবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর ভিতসুদ্ধ থরথর করে কেঁপে উঠছে আমাদের দোতলা কাঠের বাড়ি। হঠাৎ এক-সময়ে মোটা ফোঁটায় চড়্বড় করে বৃষ্টি নামল। টিনের চালে তার শব্দ বাজতে থাকল। বৃষ্টি নামলে বাতাস পড়ে যায়, ঝড়ের আক্রোশ কমে আসে। আজ কিন্তু তেমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। একই সঙ্গে চলতে লাগল মুষলধার বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব। ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়ার ফুটো দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়েছিলুম। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেয়েছিলুম, নারকোল-গাছগুলো আথালি-পাথালি মাথা কুটছে। অন্য কিছু চোখে পড়ল না; সবই কেমন ধোঁয়ায়-ধোঁয়াকার। কাছেই কোথাও মড়মড় করে একটা গাছ ভেঙে পড়ল; আর তখুনি আমাদের পিছনের বাড়ি থেকে এমন একটা কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল যে, মনে হল, পৃথিবীর একেবারে বুকের ভিতরে কোনও সর্বনাশ ঘটে গেছে, আর সেই মর্মস্থল থেকে একটা ভয়ঙ্কর হাহাকার যেন তালগোল পাকিয়ে উপরে উঠে আসছে।

বড়-কাকীমা ইতিমধ্যে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসে, ব্যাকুল গলায় ঠাকুমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হইছে, মা? ওই বাড়িতে কী হইছে? ডাকাইত পড়ে নাই তো?"

উত্তরের জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মানুষের হাহাকার আর বাতাসের শাসানি ছাপিয়ে ভেসে এল মধ্যের বাড়ির রাঙা-জ্যাঠামশাইয়ের মর্মান্তিক চিৎকার—"ধলা-খুড়ীমা, সর্বনাশ হইছে, আমাগো ঘরের বেড়া পইড়া গেছে।"

শুনে, উত্তরের জানলাটাকে অল্প-একটু খুলে, ঠাকুমাও চেঁচিয়ে বললেন, "চইলা আয়, হতভাগা। বইসা রইছিস ক্যান্? বাঁচতে হইলে সক্কলরে লইয়া

এত্তিবেলায় চইলা আয়।"

ঝড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে বিশেষ লাভ হয় না। বাতাস আমাদের কণ্ঠস্বরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে থাকে, ফলে মধ্যপথেই আমাদের সমস্ত আহ্বান ছত্রখান হয়ে যায়। ঠাকুমার গলা ও-বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল কিনা, কে জানে। কিন্তু রাঙা-জ্যাঠামশাইরা যে তাঁর আহ্বানের জন্যে বসে ছিলেন, তাও নয়। খানিক বাদেই তাঁদের বাড়িসুদ্ধ সবাই ভিজে একশা হয়ে আমাদের বড়-ঘরে এসে উঠলেন। কিন্তু সেখানেও বেশীক্ষণ বসা গেল না। জাগীর-দাদা ইতিমধ্যে এক দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছিল। এতক্ষণ সে একটাও কথা বলেনি। এবারে একটা নারকোল-গাছ আমাদের বড়ঘরের লাগোয়া ঢেঁকি-ঘরের আধখানাকে সঙ্গে নিয়ে মাটির উপরে সটান শুয়ে পড়তেই সে ঠাকুর্দাকে বলল, "কার্তাবাবু, আখুন আর তুদের ইধারে থাকা ঠিক হোবে না। তুরা সব ঠাকুর-ঘরমে চলিয়ে যা।"

জাগীর-দাদা বড়-ঘরের পাহারায় রইল। বাসন-কোসন, সিন্দুক ইত্যাদি সবই তো সেইখানে, সে-সব ছেড়ে সে অন্য-কোথাও যেতে রাজী নয়। অনেক বলেও তাকে আমরা নড়াতে পারলুম না। "হামি জলন্ধরকা পালোয়ান আছি; ই শালার বারিষকো হাম্ থোড়াই ডরতা," জাগীর-দাদার এই কথার জবাবে চোখ পাকিয়ে "ব্যাটা, সেই ন্যাংটো বয়েস থেকে বাংলাদেশে আছিস, ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে এক-এক বেলায় তিন-থালা করে বালাম চালের ভাত ওড়াচ্চিস, তবু তোর পান্জাবী চালবাজি গেল না" বলে ঠাকুর্দা আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেন, "চল, তাহলে ঠাকুরের আশ্রয়েই যাওয়া যাক।"

তক্ষুনি আমরা দু-বাড়ির লোক উঠোনে নেমে, গাছ-গাছালির উল্টোপাল্টা ঝাপ্টানির থেকে মাথা বাঁচিয়ে, জল-কাদা ভেঙে, বাতাস ঠেলে আমাদের ঠাকুর-ঘরে গিয়ে উঠলুম। মধ্যের বাড়ির লোকই বেশী। মেজো-জ্যাঠামশাই, সেজো-জ্যাঠামশাই, রাঙা-জ্যাঠামশাই, টগরকাকা, দুই জ্যাঠাইমা, কাকীমা, বনোদিদি, নিমাইদাদা, মেঘু ইত্যাদি সব্বাই এসেছে। আমাদের বাড়ির লোক বলতে মাত্র চারজন। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বড়-কাকীমা আর আমি।

ছোট্ট ঠাকুর-ঘর; দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দশ হাত বাই আট হাতের বেশী হবে না। চালও অন্যান্য ঘরের চালের তুলনায় অনেক নিচু। ফলে বাতাসের ঝাপটাও অন্যান্য ঘরের চাইতে অনেক কম লাগে। তার মধ্যে এসে হুড়মুড় করে সবাই ঢোকা গেল। বাইরে ওদিকে ঝড়ের দাপট উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বেড়ার ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যেও যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকছে না, তা নয়। তারই মধ্যে ঠাকুর্দা অনেক কষ্টে একটা পিদিম জ্বালালেন। তারপর টিনের চালের অবস্থাটা একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দাঁড়িদড়া নিয়ে এসেছ তো যতীন্দ্র?"

যতীন্দ্র অর্থাৎ রাঙা-জ্যাঠামশাইয়ের এ-সব কাজে ভুল হয় না। হুঁশিয়ার মানুষ, কখন যে কোন্ জিনিসটার দরকার হবে, সে-সব তাঁর নখদর্পণে। গরু বাঁধবার শক্ত এক গোছা দড়ি তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। কোঁচড় থেকে

সেই দড়ির বানডিল বার করে এবারে প্রত্যেকের হাতে-হাতে তিনি ধরিয়ে দিলেন। তারপর ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকা, আর দেরি কইরা লাভ নাই, বাইন্ধা ফেলি?"

ঠাকুর্দা বললেন, "নাও, বেশ শক্ত করে বাঁধো।"

যে যার হাতের দড়ি চালের বাঁতার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলুম আমরা; তারপর সেই দড়ির দুই মুড়ো মুঠোর মধ্যে প্রাণপণে চেপে ধরে বসে রইলুম। চোখ বুজলে সেই দৃশ্য এখনও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। মাঝখানে শালগ্রাম শিলা; তার চতুর্দিকে, গাদাগাদি করে, হাঁটু মুড়ে আমরা বসে আছি, আর দড়ির মুড়ো চেপে ধরে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি:

"হে নারায়ণ, রক্ষা করো..."

"কেষ্ট-ঠাকুর, রক্ষা করো..."

"মা-দুর্গা, রক্ষা করো..."

"হে মা কালী, রক্ষা করো..."

তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে ডাকতে-ডাকতে আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডাকার তবু বিরাম নেই। দড়ির ঘষটানিতে হাতের তালু জ্বালা করছে, তবু মুঠোয় এতটুকু আলগা দেবার উপায় নেই। রাঙা-জ্যাঠামশাই বলে দিয়েছেন, দড়িতে ঢিল পড়লেই ঝড়ের ঝাপটায় ঘরের চাল উড়ে যাবে। সেই ঝাপট্ এক-একবার ঠাকুর-ঘরের উপরে এসে আছড়ে পড়ে, আর আমাদের চিৎকারও অমনি চতুর্গুণ বেড়ে যায়। চতুর্গুণ আতঙ্কে আমরা চেঁচিয়ে উঠি, "হে নারায়-ণ, রক্ষা করো..."

তারই মধ্যে একবার বনোদিদি আমাকে চাপা-গলায় জিজ্ঞেস করেছিল যে, ঠাকুর-দেবতাকে এইভাবে 'তুমি' বলে সম্বোধন করাটা ঠিক হচ্ছে কিনা। তার বিশ্বাস, "হে নারায়ণ, রক্ষা করো" না-বলে "হে নারায়ণ, রক্ষা করেন" বললে হয়ত নারায়ণের পক্ষে আর-একটু সদয় হওয়া সম্ভব। শুনে মনে হল, বনো-দিদি ঠিকই বলেছে। সেই অনুযায়ী দু-চারবার আমরা দুজনে "রক্ষা করেন" "রক্ষা করেন" বলে চেঁচালুমও। কিন্তু তাতে যে বিশেষ কাজ হয়েছে, এমন মনে হল না।

ঘরের মধ্যে ভাসুর-ঠাকুররা রয়েছেন, বড়-কাকীমার তাই কথা বলবার উপায় নেই, একগলা ঘোমটা টেনে চুপ করে তিনি বসে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর কোলের কাছে টেনে নিয়ে আঁচল নিংড়ে আমার মাথা মুছিয়ে দিলেন তিনি। কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বললেন, "ভয় পাইস না, রাইত কাটুক, তারপর বিয়ানে তোরে ফ্যানাভাত রাইন্ধা দেব। কাওনের পায়েসও এক বাটি তোর জইন্যে রাইখা দিছি। ও আমার সোনা, ও আমার মানিক, ক্ষিধায় দেহি মুখখান্ এক্কেরে শুকাইয়া গেছে।"

মধ্যের বাড়ির সেজো-জ্যাঠামশাই কারও সঙ্গে কোনও কথাই বলছিলেন না। শূন্য চোখে এক-একবার শুধু আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর মাটিতে চাপড়

মেরে দারুণ আক্ষেপে ফ‍ুঁপিয়ে উঠছিলেন, "আ-হা-হা-হা-হা, সব গেল, সব চইলা গেল।"

মেজো-জ্যাঠামশাই সন্ন্যাসী মানুষ। বিয়ে-থাওয়া করেননি। যৌবন-বয়সে বিবাগী হয়ে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, প্রৌঢ়-বয়সে আবার ফিরে এসেছেন। পুজো-আচ্চা যাগ-যজ্ঞে সময় কাটে। গলায় ও দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। ঠাকুর-ঘরের এককোণে বসে চুপচাপ তাঁর দাড়িতে তিনি হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, সমবেত প্রার্থনায় একবার একটু ছেদ পড়তেই, কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে, ঠাকুর্দাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বোঝেন কাকা? তুফান কি আইজ সারা রাত্তিরই চলবে?"

আকাশ ফেঁড়ে এই সময়ে হঠাৎ কড়-কড়াৎ করে একটা বিকট রকমের শব্দ উঠতেই তিনি আবার চুপ করে গেলেন। ভয় পেয়ে আমি বড়-কাকীমাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম। বনোদিদি আর মেঘুও হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। টগর-কাকা তাদের "ভয় নাই, ভয় নাই" বলে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাঙা-জ্যাঠামশাই বললেন, "কাছেই ঠাঠা পড়ছে।"

ঠাকুর্দা বললেন, "যে-বাজের শব্দ শুনেছ, সেই-বাজে আর মারা পড়বার ভয় নেই। কিন্তু, যতীন্দ্র, তোমাদের এই বাঙাল-দেশে এসে তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি।"

বিদ্যুতের চমকে ঘরটা মাঝে-মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। সবাই আবার নতুন করে চেঁচাতে শুরু করেছিল, "হে মা কালী, রক্ষা করো...হে মহাদেব, রক্ষা করো...কেষ্ট-ঠাকুর, রক্ষা করো...।"

হাতের দড়ি কখন যেন আলগা হয়ে গিয়েছিল আমার। বিদ্যুতের চমক দেখতে দেখতে, আর্ত প্রার্থনা শুনতে শুনতে কখন যে আমি বড়-কাকীমার কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিচ্ছু মনে নেই।

জাগীরদার সিংয়ের ঠেলা খেয়ে আমার ঘুম ভাঙল। ঠাকুর্দা তাকে কখনও বলেন 'জাগীরদার', কখনও বলেন 'জাগ্গু'। মাঝে-মধ্যে আবার ঠাট্টা করে 'পাগ্লাজগাই'ও বলেন। আমি বলি 'জাগীর-দাদা'।

চোখ মেলে দেখলুম, ঠাকুর-ঘরে নয়, বড়-ঘরের মধ্যেই আমি শুয়ে আছি। সকাল হয়েছে। কিন্তু আকাশ তখনও মেঘলা। হালকা কুয়াশার মতো মেঘ। আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিকে উড়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া। সূর্য উঠেছে। কিন্তু রোদ্দুরে মোটেই তেজ নেই। মেঘের আড়ালে সূর্য এক-একবার ঢাকা পড়ছে এবং পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে আসছে। অন্য দিন তো সূর্যের দিকে তাকালেই চোখে ধাঁধা লেগে যায়, আজকের সূর্যকে সেই তুলনায় অনেক ম্লান ও জোলো দেখাচ্ছে, তার দিকে তাকাতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। জাগীর-দাদার কাছেই শুনলুম যে, গোটা গ্রামে মাত্র খান-চারেক ঘর কোনক্রমে টিকে গেছে; বাকী সব ঝড়ের ধাক্কায় ধরাশায়ী। টিকে থাকবার

মধ্যে আছে আমাদের বাড়ির বড়-ঘর আর ঠাকুর-ঘর, উত্তরের বাড়ির একখানা ঘর আর মজুমদার-বাড়ির একখানা। এ-পাড়ায় বাকী সব ঘর-দুয়ার এখন মাটির উপরে শুয়ে আছে। দত্ত-পাড়াতেও ঘর বলতে কিছু আর খাড়া নেই।

জাগীর-দাদা বলল, "চল্ তুকে সব দেখাইয়ে আনি।"

ভিজে কাঠখড় দিয়েই কোনক্রমে উনুন ধরিয়ে বড়-কাকীমা ইতিমধ্যে আমার ফ্যানাভাতের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। মুখ-চোখ ধুয়ে, ভাত খেয়ে, জাগীর-দাদার কাঁধে চেপে আমি গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়লুম।

বড়-কাকীমা তাকে বলে দিয়েছিলেন যে, মাত্র দিন-তিনেক আগেই আমি জ্বরের থেকে উঠেছি, তার উপর আবার কাল রাত্তিরে খুব ধকল গেছে, সুতরাং কিছুতেই যেন আমাকে আর কাদামাটিতে নামতে দেওয়া না হয়। আমাকেও শাসিয়ে রেখেছিলেন, "খবরদার ছাওয়াল, যদি শুনি যে, তুমি কান্ধের থিকা মাটিতে নামছ, তয় আর বাড়ি ফেরার পরে তোমারে আস্ত রাখব না।"

বাড়ির থেকে বার হয়েই কিন্তু জাগীর-দাদার পিঠে গুম্-গুম্ করে গোটা-কয়েক কিল বসিয়ে দিয়ে আমি মাটিতে নেমে পড়লুম। বললুম, "কক্ষনো আমারে আর কাঁধে তুইলো না; আমার খুব লজ্জা লাগে।"

জাগীর-দাদাও তাতে বিশেষ বেজার হল না। বরং একগাল হেসে বলল, "হাঁ হাঁ, এহি তো পালোয়ানকা মাফিক কাম আছে। দৌড়ঝাঁপ করবি, খেল্-কুদ্ করবি, মকানমে ফিরে ডাল-রোটি খাবি, বাস্, বোখার আর কভি না তুকে ছুঁতে পারবে।"

গ্রাম দেখতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু দেখবার আর বিশেষ-কিছু বাকী ছিল না। ঠাকুমার মুখে দৈত্য-দানোর গল্প শুনেছিলুম; মনে হল, অত্যন্ত গোঁয়ার ও বলবান একদঙ্গল দৈত্য যেন কাল ঝড়ের সময় আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছিল, লাথি মেরে-মেরে আমাদের ঘরবাড়ি আর গাছপালাকে তারা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে। যেখানে যাই, একই দৃশ্য। মাটির ভিত, তার উপরে বাঁশ আর শালবল্লির খুঁটিগুলো কোথাও-কোথাও খাড়া হয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু মাথার উপরে যে-বস্তুটাকে ধরে রাখবে বলে এইভাবে তাদের দাঁড়িয়ে থাকা, সেইটেই যথাস্থানে নেই। টিন আর খড়ের ছাউনিগুলো সব দূরে-দূরে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বাসী মড়া ব্যাঙ যে-রকম চার পা ছড়িয়ে পথের উপরে পড়ে থাকে। এক জায়গায় গোটাকয়েক পাখির বাসাও পড়ে থাকতে দেখলুম। ডিমগুলো ভেঙে গেছে। তার থেকে রস গড়াচ্ছে। গোটাকয়েক ঝুস্-শালিখ তার কাছেই একটা আশ্-শ্যাওড়ার ঝোপের ধারে বসে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকছে। চতুর্দিকে বাঁশ আর খড়ের ছড়াছড়ি। ভিজে খড়। ঝোঁড়ো হাওয়ায় গাদা থেকে উড়ে গিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। পথের উপরে ভেঙে পড়ে আছে হোগলা, পাটকাঠি আর ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়া। তারই মধ্যে সবাই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। আমাদের বাড়ির থেকে খানিক দূরেই শ্মশান-ভিটে। মাস কয়েক আগে ও-পাড়ার তুলসী-

দার ঠাকুমাকে যখন দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, বড়-কাকীমার চোখ এড়িয়ে আমিও তখন খই ছড়াতে ছড়াতে শ্মশানে গিয়েছিলুম। মনে পড়ল, সেখানেও ঠিক এই রকমের বাঁশের ছড়াছড়ি দেখেছি। সেখানেও ঠিক এইভাবেই সবাই নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছিল।

বড় মিত্তির-বাড়ির কাজল-দিদি দেখলুম শুকনো-মুখে একটা জিওল-গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ইশারা করে কাছে ডাকল। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "তর কালাদা কেমন আছে রে?"

কালাদা আসলে রসুলপুরের ছেলে। মজুমদার-বাড়ির জ্যাঠাইমা তার পিসি হয়। পিসির কাছে থেকেই কালাদা গতবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু তারপরে আর রসুলপুরে ফিরে যায়নি। মধ্যের বাড়ির কাকীমা বলেন, "মজুমদার-বাড়ির দিদির তো কালার-বয়সী এট্টা ছাওয়াল ছিল। সেই ছাওয়াল মরার পরে কালারে এইখানে আইনা রাখছে। অরে আর ফেরত দেবে বইলা মনে হয় না।"

আসবার সময় কালাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে তখন খুঁটি বেঁধে একটা ডালিমগাছকে আবার দাঁড় করাচ্ছে। কাজল-দিদিকে সেই কথা বলতে সে বলল, "তর কালাদারে কইস যে, আমরাও ভাল আছি। কারও কিছু হয় নাই।"

ফিরতি-পথে দত্ত-পাড়ার ভুবন-দাদুকে দেখলুম। চুপচাপ একটা মরচে-পড়া তোরঙ্গের উপরে তিনি বসে ছিলেন। ভুবন-দাদু অন্ধ। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, একবার একটা মামলায় মিথ্যে-সাক্ষী দেওয়ার পরেই তিনি অন্ধ হয়ে যান।

বাড়ি ফিরে দেখলুম, আইনদ্দী-কাকা এসেছে। ঠাকুর্দা তার হাতে একখানা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "মাত্তর তো দু ক্রোশ পথ। এক ছুটে বীরপুর চলে যাও। পথে কোথাও দাঁড়াবে না। নদীতে যদি খেয়ানৌকো না পাও তো সাঁতরে পার হবে। বুঝলে?"

আইনদ্দী-কাকা রওনা হয়ে গেল। ঠাকুমা ইতিমধ্যে ভিতর-বাড়ি থেকে বাইরের উঠোনে বেরিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুর্দাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই বিয়ান-বেলায় আবার আইনদ্দীরে তুমি কোথায় পাঠাইলা?"

ঠাকুর্দা বললেন, "বড়-ডাকঘরে।" তারপর, একটু থেমে, বললেন, "ইন্দ্রজিৎকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলুম। নতুন করে আবার ঘর তুলতে হবে। তাই জানিয়ে দিলুম, এ-মাসে অন্তত শ-তিনেক টাকা যেন পাঠিয়ে দেয়। তার কমে হবে না।"

ইন্দ্রজিৎ আমার বাবার নাম। ঠাকুর্দার কথায় মনে পড়ল যে, বাবাকে অনেক-দিন দেখিনি। চুপচাপ পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে বসলুম। আকাশ এখনও মেঘলা। পুকুরের মধ্যে মেঘের ছায়া পড়েছে। পুবদিক থেকে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। জোলো হাওয়া। সেই হাওয়া লেগে পুকুরের জল তিরতির করে কাঁপছে। এইসব মেঘলা দিনে সবকিছুকেই, কী জানি কেন, খুব কোমল ও করুণ মনে হয়।

॥ ২ ॥

আমার ঠাকুর্দার নাম শ্রীলোকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কখনও তাঁকে চিঠি-পত্রে কিংবা দলিল-দস্তাবেজে 'চট্টোপাধ্যায়' লিখতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। কোনও-কিছুতে দস্তখত করতে হলে, প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে যেমন দেখা যায়, সেইরকমের ঋজু, কৌণিক ও রেখাবহুল হরফে তিনি সদাসর্বদা লিখতেন 'শ্রীলোকেশ্বর দেবশর্মণঃ'। কখনও এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিনি। শীর্ণ, অতিকৃষ্ণ, খর্বাকার মানুষ—এখনও আমার মনে আছে যে, তাঁর নির্মেদ কালো শরীরে ধপ্‌ধপে শুভ্র উপবীতটি খুব স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ত।

ঠাকুর্দা খুব জেদী মানুষ। বর্ধমান জেলার মানকরে তাঁর জন্ম। কিন্তু সেখানে তাঁর কখনও স্থায়ীভাবে থাকা হয়নি। আমার প্রপিতামহ অর্থাৎ লোকেশ্বরের পিতৃদেব শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ফারসী-জানা আইনজীবী। জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকেশ্বরের বয়স যখন তিন বছর, সেই সময়ে কর্মসূত্রে তাঁকে যশোহরে চলে যেতে হয়। ফলে আমার পিতামহের শৈশব, ও বাল্যবয়সেরও একটা অংশ, সেইখানে কাটে। সেই যশোহরেরই এক পাঠশালায় শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষকে তিনি সতীর্থ ও বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট ছিল। লোকেশ্বরের বয়স যখন বারো বছর, সেই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মাতৃদেবী তার আগেই মারা গিয়েছিলেন। এবারে পুরোপুরি অনাথ হয়ে, একমাত্র অনুজ সর্বেশ্বর ও বালক-ভৃত্য জাগীরদারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মানকরে চলে এলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর ঠাঁই হল না। যজ্ঞেশ্বরের দূর-বাসের সুযোগ নিয়ে মানকরের জ্ঞাতিবর্গ তাঁর জোত-জমি সব নির্বিবাদে ভোগ করে যাচ্ছিলেন, এখন লোকেশ্বরের এই হঠাৎ-আবির্ভাবে তাঁরা মোটেই প্রসন্ন হলেন না। এ-সব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, অর্থাৎ সচরাচর যা হয়ে থাকে, তা-ই হল। জ্ঞাতিরা সবাই একজোট হয়ে লোকেশ্বরের পিছনে লাগলেন। রটিয়ে দেওয়া হল যে, যশোহরে থাকবার সময় যজ্ঞেশ্বরের আচারে-বিচারে নানা বিচ্যুতি ঘটেছিল। ফলে মানকরের পৈতৃক ভিটেয় লোকেশ্বরের তে-রাত্তিরও কাটল না। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, স্বর্গত পিতার 'পাপ' খণ্ডাবার জন্যে তিনি যদি একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী থাকেন, তাহলে, জোত-জমির দখল ফিরে না পেলেও, পিতৃপুরুষের ভিটেয় তাঁকে থাকতে দেওয়া হবে। কিন্তু জেদী বালক তাতে রাজী হলেন না। সর্বেশ্বর ও জাগীরদারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতার পথে পা বাড়ালেন। জীবনে তিনি আর মানকরে ফিরে যাননি। আমরা এ-সব কথা ঠাকুমার মুখে শুনেছি, কেননা মানকরের নামও ঠাকুর্দা আর মুখে আনতেন না। কিন্তু অতিদূর শৈশবের সেই

বেদনাবহ ঘটনাকে যে তিনি সর্বৈব ভুলতে পেরেছিলেন, তাও নয়। আপন পিতৃভূমিতে ঠাঁই না পাবার যন্ত্রণা ও অপমান বস্তুত তাঁর বুকের মধ্যে একটা বিষাক্ত কাঁটার মতো বিঁধে ছিল, এবং—ঘুণাক্ষরে কাউকে কিছু না জানালেও—সেই কাঁটা যে তাঁর মর্মমূলে নিয়ত রক্ত ঝরাত, লোকেশ্বরের মৃত্যুকালে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে-কথা পরে হবে।

কলকাতায় এসে লোকেশ্বর, সর্বেশ্বর ও জাগীরদার প্রথমে একটা তামাকের আড়তে ও পরে একটা বইয়ের দোকানে কাজ নিয়েছিলেন। লোকেশ্বরের বয়স তখন বারো; সর্বেশ্বরের আট, জাগীরদারের দশ। ওই বয়সেই তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন যে, পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা, এবং এই মর্মান্তিক উপলব্ধি—সর্বেশ্বর ও জাগীরদারকে বিশেষ ক্লিষ্ট না করলেও—অন্তত লোকেশ্বরকে তাঁর বয়সের অনুপাতে একটু বেশী-মাত্রায় কঠিন করে তুলেছিল। আর-কিছু নয়, স্রেফ দু বেলা দু মুঠো ভাতের জন্য তাঁদের হাড়ভাঙা কাজ করতে হতো। কিছুটা কুলি-মজুরের, কিছুটা গোমস্তার ও কিছুটা কেরানীর কাজ। ছাপাখানা থেকে ফর্মার বানডিল মাথায় তুলে তাঁরা দফতরির বাড়িতে পেঁাছে দিতেন, বাঁধাই হবার পরে সেগুলিকে আবার মাথায় চাপিয়ে দোকানে নিয়ে আসতেন. দোকান থেকে এখানে-ওখানে মালিকের হয়ে আদায়-পত্রের তাগাদা দিতে যেতেন, এবং কখনও-কখনও দোকানে বসেই বইপত্র বিক্রি করতেন।

এই বইয়ের দোকানের চাকরির সূত্রেই একদিন লোকেশ্বরের সঙ্গে হঠাৎ রামজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়ে যায়।

রামজয় পূব-বাংলার সম্পন্ন গৃহস্থ। সেখানে তাঁর একশো বিঘের মতো দো-ফসলা জমি ছিল। যেমন গ্রামে, তেমনি জেলার সদর-শহরেও একটা বাড়ি ছিল। তা ছাড়া ছিল পাটের ব্যবসা। সেই ব্যবসার সূত্রে বছরে অন্তত একবার তাঁকে কলকাতায় আসতে হতো। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানি তখন নাম-করা বইয়ের দোকান। তার মালিক রামজয়ের পুরনো বন্ধু। ব্ল্যাক টাউন অর্থাৎ শহরের বাঙালী-পাড়ায় তখনও হোটেলের চল হয়নি। হাসপাতাল, হোটেল ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের সংস্কারও তখন অতি প্রবল, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে সতর্কতার অভাব ঘটলে সমাজচ্যুত হবার ভয় থাকত। ফলে, কলকাতায় এলে বন্ধুর বাড়িতেই উঠতেন রামজয়। সেই সময় বাড়ির একতলায় বইয়ের দোকানেও মাঝেমধ্যে এসে বসতেন। লোকেশ্বরের সঙ্গেও তখন দু-চারটে কথাবার্তা হতো। রামজয় লক্ষ্য করতেন যে, ভাগ্যদোষে এই ছেলেটির ছাত্রজীবনে ছেদ পড়লেও পড়াশুনোয় তার উৎসাহ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। দোকানে যখন খদ্দের থাকে না, তখন, গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে, তাকের থেকে যে-কোনও একটা বই নামিয়ে সে মগ্ন হয়ে পড়তে থাকে। বন্ধুর কাছে লোকেশ্বরের পূর্ব-ইতিহাস তিনি শুনেছিলেন। এই দুঃখী অথচ জেদী কিশোরটিকে তাঁর খুব ভাল লেগে যায়।

লোকেশ্বরের বয়স তখন সতের। সততা ও কর্মনিষ্ঠায় বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানির

মালিককে যে তিনি খুশী করতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই, কেননা, বইয়ের দোকানের পুরোপুরি দায়িত্ব ইতিমধ্যে তাঁরই উপরে ন্যস্ত হয়েছিল। মাসমাইনে ধার্য হয়েছিল পনর টাকা। আজকের দিনে পনর টাকায় একখানা ধুতিও মেলে না; কিন্তু এ হল ১৮৭৭ সনের কথা, ওই টাকায় এই কলকাতা-শহরেই তখন একখানা ঘর ভাড়া করে ছোটখাটো একটা সংসারকে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই চালিয়ে নেওয়া যেত।

লোকেশ্বর কিছুটা সচ্ছল হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ভাত-কাপড়ের দুশ্চিন্তা ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছিল। কিন্তু চিত্তে তবু শান্তি ছিল না। তার কারণ, এর বছর দুয়েক আগে একদিন গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সর্বেশ্বর হঠাৎ হারিয়ে যায়। তার সম্পর্কে নানা রকমের উল্টোপাল্টা খবর শুনতে পাচ্ছিলেন লোকেশ্বর। কেউ বলছিল, সর্বেশ্বর হারিয়ে যাবার দু-তিন দিন বাদে আহিরীটোলার গঙ্গায় এক বালকের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়; তার চেহারা অনেকটা সর্বেশ্বরের মতো। কেউ বলছিল, নৌকোয় করে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে সর্বেশ্বরকে গঙ্গা পার হতে দেখা গেছে। কেউ বলছিল, একজন নিঃসন্তান বড়লোকের বউ পাল্কি করে গঙ্গায় চান করতে গিয়েছিল, সর্বেশ্বরকে সে-ই ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে পোষ্যপুত্র করেছে। এর মধ্যে কোন্‌টা যে সত্যি খবর, লোকেশ্বর বুঝতে পারছিলেন না। দিনে-দিনে তিনি শুধু আরও কঠিন ও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন।

ঠিক এই সময়ে রামজয় তাঁকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল যে, অনাথ, আত্মীয়-পরিত্যক্ত, উদাসীন অথচ পরিশ্রমী এই কিশোরটিকে তিনি আপন করে নেবেন, এবং যা সে পেয়েছিল কিন্তু অদৃষ্টের কাছে মার খেয়ে যা সে ধরে রাখতে পারেনি, সেই পারিবারিক জীবনের মধ্যে পুনশ্চ তাকে প্রতিষ্ঠা দেবেন। প্রস্তাব এল বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানির মালিকের মাধ্যমে। রামজয় তাঁর মারফতে জানালেন যে, লোকেশ্বরকে তিনি পূর্ববঙ্গে নিয়ে যেতে চান, একমাত্র কন্যা চিত্তসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে চান, এবং বসতবাড়ি ও কয়েক বিঘে চাষের জমি দিয়ে সেইখানেই তাঁর স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করতে চান।

লোকেশ্বরও নিশ্চয় খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন। হয়ত সেই কারণেই রামজয়ের প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, রাজকন্যায় অরুচি না থাকলেও অর্ধেক রাজত্বে তাঁর স্পৃহা নেই। অর্থাৎ ঘরজামাই হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি কলকাতাতেই থাকবেন, এবং যেমন করছেন, ঠিক তেমনিভাবেই বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানির চাকরি করে যাবেন। তবে হ্যাঁ, শতখানেক টাকা তাঁর হাতে আছে; রামজয় যদি ইচ্ছে করেন, তবে সেই টাকায়—তাঁদের নিজেদের গ্রামে নয়—কাছাকাছি অন্য-কোনও গ্রামে তিনি লোকেশ্বরের জন্যে কিছু জমি কিনে রাখতে পারেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে, যদি ইচ্ছে হয়, লোকেশ্বর সেখানে গিয়ে মাথা গুঁজবার মতো একটা বাড়ি তুলে নেবেন। বসতবাড়ির এই জমি কিনবার ব্যাপারে একটি-মাত্র শর্ত ছিল লোকেশ্বরের। রামজয় তাঁকে যে জমি কিনে দেবেন, তার দক্ষিণ-

দিকটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকা চাই।

চিত্তসুন্দরী আমার ঠাকুমার নাম। পরবর্তী ফাল্গুন মাসেই লোকেশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। ঠাকুমার বয়স তখন সাত বছর।

এক মাসের ছুটি নিয়ে, রামজয়ের পাঠানো লোকের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। রেলগাড়িতে নয়। বেলেঘাটার খাল থেকে নৌকাযোগে। কলকাতা থেকে কোনও বরযাত্রী যায়নি। পুরোহিত কিংবা নাপিতও না। একমাত্র সঙ্গী ছিল জাগীরদার। সে-ই তখন লোকেশ্বরের একমাত্র আপনজন। তাকে ভৃত্য বললে কমই বলা হয়; কোনও ব্যাপারে তার কিশোর-মনিবের বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে কিনা, সতত সে-দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং অষ্টপ্রহর তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করাকেই সে যেন তার জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে জেনেছিল। অন্যদিকে, ছেলেবেলায় যেহেতু সে কখনও-কখনও লোকেশ্বরের খেলাধুলোর সঙ্গী হয়েছে, তাই—বয়সে বছর-দুয়েকের ছোট হওয়া সত্ত্বেও—মাঝেমধ্যে তাঁর সঙ্গে সে ঠাট্টা-তামাশা করতেও ছাড়ত না। সর্বসমক্ষে ঠাকুর্দাকে সে 'দাদাবাবু' কিংবা 'কর্তাবাবু' বলে সম্বোধন করত ঠিকই, কিন্তু আড়ালে বলত 'লোকুয়া'। গল্প শুনেছি, নৌকো যখন আড়িয়ল খাঁয়ে পড়ে, তখন তার ফাল্গুন মাসের চেহারা দেখেই জাগীরদার নাকি বিষম ঘাবড়ে গিয়েছিল, এবং দু হাত জোড় করে লোকেশ্বরকে বলেছিল, "হা রে লোকুয়া, নৌকা ঘুমাকে আভি কলকত্তা চলো ভাইয়া, নেহি তো তুম মর্ যাওগে।"

ঠাকুর্দা অবশ্য জাগীরদারের কথায় কান দেননি। যথাসময়ে তিনি নৌকো থেকে খাবাসপুরের ঘাটে নেমেছিলেন এবং বিবাহ করে কলকাতায় ফিরেছিলেন। সাত বছরের কনে, কলকাতায় তাঁর শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদ বলতে কিছুই নেই, এই অবস্থায় তাঁকে স্বামীর সঙ্গে পাঠাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, চিত্তসুন্দরী তাই তখনকার মতো পিত্রালয়েই রয়ে গেলেন। তার ছ' বছর বাদে, সিমলেপাড়ায় বাসা ভাড়া করে, লোকেশ্বর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। শুনেছি, পাড়া-প্রতিবেশীদের বউ-ঝিয়েরা তাঁকে 'বাঙাল-বউ' বলে ডাকত। 'চিত্ত' বলে ডাকতেন শুধু একজন—নরেন্দ্রনাথের জননী ভুবনেশ্বরী দেবী। সিমলের দত্ত-বাড়ির সঙ্গে লোকেশ্বরের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। নরেন্দ্রনাথ তখনও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে শুরু করেননি। তিনি তখন বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। লোকেশ্বরের চাইতে তিনি দু-তিন বছরের ছোট; ঠাকুর্দা তাঁকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানির থেকে নানা রকমের বই এনে তাঁকে পড়তে দিতেন। পারিবারিক এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ঠাকুমাও কখনও-কখনও দত্ত-বাড়িতে গিয়েছেন। ভুবনেশ্বরী তাঁকে কাঁচা আম পুড়িয়ে শরবত করতে, লুচি বেলতে এবং শাঁখ ঝিনুক ইত্যাদি নানা বিচিত্র আকারের বড়ি দিতে শিখিয়েছিলেন।

লোকেশ্বর ও চিত্তসুন্দরীর প্রথম সন্তান একটি কন্যা। আমার বাবা ইন্দ্রজিতের চাইতে তিনি তিন বছরের বড়। পূর্ববঙ্গের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। বড় পিসেমশাই চাকরি করতেন বর্ধমানের রাজ এস্টেটে। বড় পিসিমাও বর্ধমানেই থাকতেন, তিনি কখনও পূর্ববঙ্গে যাননি। মাত্র পনর বছর বয়সে, একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে সূতিকাগারেই তিনি মারা যান।

বাবার জন্ম ১৮৯২ সনে। তারপর, দীর্ঘদিনের মধ্যে ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার কোনও সন্তান হয়নি। আমার তিন কাকা ও তিন পিসিমা। বয়সে তাঁরা বাবার চাইতে অনেক ছোট। ছোট পিসি তো বলতে গেলে আমার দিদির মতো; বাবার সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান পঁচিশ বছরের কম নয়।

ঠাকুর্দা খুব মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁর আত্মমর্যাদার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীব্র। ধারকর্জ করে সংসার চালানোয় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। শুধু তা-ই নয়, তাঁর দু-তিনজন বাল্যবন্ধু পরবর্তীকালে খুব বিত্তবান ও প্রতিষ্ঠাশালী হয়েছিলেন বটে, এবং লোকেশ্বরের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও ছিল বটে, কিন্তু, এমন কী, তাঁদের কাছেও কখনও কোনও অনুগ্রহ তিনি চাননি। শুনেছি, মাত্র একবারই এর ব্যতিক্রম ঘটে। উপায়ান্তর না থাকায় প্রার্থী হয়ে সেবারে তাঁকে বাল্যবন্ধু ঈশানচন্দ্রের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু সে-কথাও পরে হবে। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যাক যে, তিনি আয় বুঝে ব্যয় করতেন। তাঁর মাস-মাইনে ইতিমধ্যে তিরিশ টাকায় পেঁৗছেছিল, কিন্তু সেই তিরিশ টাকাও তিনি একসঙ্গে নিতেন না। পাছে, আগেভাগেই খরচা হয়ে যায় ও মাসের শেষে অর্থাভাব ঘটে, এই আশঙ্কায় বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানির ক্যাশ থেকে তিনি নিত্য একটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। রবিবারে দোকান বন্ধ থাকত। তাই শনিবারে আনতেন দু টাকা।

ঠাকুমা বলতেন, "তোর ঠাকুর্দার মতন হিসাবী মানুষ আমি খুব কমই দেখছি। মাসের এক-তারিখে যদি বাজারে গিয়া তিন-আনার মাছ-তরকারি কিনছেন, তো মাসের তিরিশ-তারিখেও সেই তিন-আনাই বরাদ্দ। তার আর এক-চুলও নড়চড় হওনের উপায় নাই।"

হিসেবী না হয়ে উপায় ছিল না। শহর-কলকাতায় যাঁকে বাসা ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে, সংসার যাঁর একটু-একটু করে বাড়ছে, এবং দৈনিক রোজগার যাঁর একটি টাকা, গত শতকের শেষ ও এই শতাব্দীর সূচনা-কালীন 'স্বর্গরাজ্যে'ও তাঁকে প্রতিটি ব্যাপারে রাশ টেনে টেনে চলতে হতো; একটি পাইপয়সা খরচা করবার আগে তিনবার ভাবতে হতো, কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা। অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে ইন্দ্রজিৎ যখন হেরম্ব মৈত্রের কলেজে ভর্তি হলেন, তখন—সেই টানাটানির সংসারেও—লোকেশ্বর যে তাঁর জন্যে আলাদা দুধ আর মাছের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাও ঠিক। অন্য ছেলেমেয়েদের এক ফোঁটা দুধ জোটে না, এদিকে বড় ছেলের সামনে রোজ এক বাটি দুধ এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্য ছেলেমেয়েরা মাসের মধ্যে পনের দিনই মাছ পায় না, অথচ বড় ছেলেকে

আলাদা খেতে বসিয়ে রোজ দু টুকরো মাছ দেওয়াই চাই—লোকেশ্বরের এই পক্ষপাতিত্ব দেখে চিত্তসুন্দরী কষ্ট পেতেন। পাওয়াই স্বাভাবিক। তিনি মা, সব সন্তানই তাঁর কাছে সমান। স্বামীর কাছে এ নিয়ে তিনি অনুযোগ করতেন; তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, অন্যেরাও কিছু বানের জলে ভেসে আসেনি। কিন্তু লোকেশ্বর সে-কথা কানেই তুলতেন না।

আসলে, এ-ক্ষেত্রেও তাঁর একটা পাকা-রকমের হিসেব ছিল। সেটা তিনি স্বীকারও করতেন। বলতেন, "গরিবেরও তো ঘোড়ারোগ হয়। তা ধরে নাও যে, এটাই আমার ঘোড়ারোগ। আমার যদি অঢেল পয়সা থাকত, তা হলে সব ক'টা ঘোড়ার উপরে আমি বাজি ধরতুম। কিন্তু তা তো আমার নেই, আমি গরিব মানুষ, তাই আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে ওই একটা ঘোড়ার উপরে আমি বাজি ধরেছি। ওটাকে যদি কোনক্রমে একবার জিতিয়ে আনতে পারি, তা হলে আর আমার ভাবনা থাকবে না।"

বড় হয়ে একটা গল্প পড়ি। তাতে এই রকমের একটা চরিত্র ছিল। তার কথা পড়তে-পড়তে আমি চমকে যাই। ঠাকুর্দা তো নিজের বিষয়ে বিশেষ-কিছু বলতেন না, তাঁর কথা আমরা ঠাকুমার মুখে শুনেছি। তা গল্পের এই চরিত্রটির সঙ্গে সেই কথাগুলো এমন মিলে যায় যে, আমার গা ছমছম করতে থাকে; মনে হতে থাকে, অন্য একটি মানুষের মধ্যে যেন লোকেশ্বরকেই আমি প্রত্যক্ষ করছি।

ঠাকুর্দা আসলে ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন।

সেই বাজিতে তিনি জিতেও যান। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ পাশ করলেন ইন্দ্রজিৎ; পাশ করবামাত্র কলকাতার এক নামী কলেজে চাকরি পেয়ে গেলেন। লোকেশ্বরের বয়স তখন আটান্ন; ইন্দ্রজিতের ছাব্বিশ। শৈশবে মাতুলালয়ে থাকার ফলে ইন্দ্রজিতের শিক্ষাজীবন শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়; কুড়িতে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেছিলেন। তার মাস কয়েক বাদেই তাঁর বিবাহ হয়। সেই বিবাহের পিছনেও লোকেশ্বরের হিসাবী বুদ্ধির কিছু ভূমিকা ছিল। পিত্রালয় থেকে গা-ভর্তি গহনা নিয়ে এসেছিলেন আমার মা; তারই একটা অংশ দিয়ে লোকেশ্বর তাঁর সেজো-মেয়েকে পাত্রস্থ করেন। মেজো মেয়েকে এর বছর দুয়েক আগেই তিনি তাঁর বিপত্নীক জ্যেষ্ঠ জামাতার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

চাকরি থেকে যখন অবসর নেন, লোকেশ্বরের সাংসারিক দায়িত্ব যে তখনও বাকী ছিল না, তা নয়। বাকী ছিল তাঁর আরও তিনটি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবার কাজ। তাদের বয়স তখন বারো, নয় আর চার বছর। বাকী ছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ। তার বয়স তখন মাত্রই কয়েক মাস। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে লোকেশ্বরের উদ্যমের তখন আর কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। অবসর নেবার জন্যে তিনি তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বস্তুত, তাঁর শেষ কপর্দক দিয়ে যে বাজি তিনি ধরেছিলেন, তাতে

জিতে যাবার পরে আর একটা দিনও তিনি চাকরি করেননি। ইন্দ্রজিতের চাকরির খবর পেয়েই বইয়ের দোকানের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর ইন্দ্রজিৎকে সামনে ডাকিয়ে বলেছিলেন, "বাস্, এবারে আমার ছুটি। আমি এবারে মন্দারগ্রামে যাব। সেখানে তোমার দাদামশাই আমার জন্যে জমি কিনে রেখেছেন। সেই জমির উপরে পুকুর কাটিয়ে, বাড়ি তুলে বাকী জীবনটা সেইখানেই কাটাব। অনেক কষ্ট করেছি, আর নয়। কলকাতায় আর আমি ফিরছি না।"

আমার মায়ের বয়স তখন যোলো। চিত্তসুন্দরী তাঁর শাড়ির আঁচলে চাবির তোড়া বেঁধে দিয়ে বললেন, "বউমা, ইন্দ্রজিৎরে দেইখো, তোমার দেওরদের দেইখো, কইলকাতার এই সংসারের ভার তোমার উপরেই থাকল।"

কনিষ্ঠা কন্যাকে কোলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তিনি তাঁর বাপের বাড়ির দেশে ফিরলেন। জাগীরদারও তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিল। ঠাকুর্দা তাকে কলকাতায় থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু জাগীরদার সে-কথায় কান দেয়নি। বলেছিল, "আরে রাম রাম, ফিন্ তো তুকে সেই আড়িয়ল খাঁর মুলুকমে যেতে হোবে। কার্তা, হামি তুকে একলা ছোড়বে না।"

সেই সময়ে মাস কয়েক তাঁরা খাবাসপুরে থাকেন। তেরো বছর বয়সে কলকাতায় গিয়েছিলেন চিত্তসুন্দরী, তারপরে আর পিত্রালয়ে আসা হয়নি। যখন এলেন, তাঁর চুলে তখন পাক ধরেছে। তাঁর বাবা মা—কেউই তখন বেঁচে নেই। বাবা তবু প্রথম-প্রথম বছরে একবার কলকাতায় যেতেন; মা যে কী বস্তু, বলতে গেলে চিত্তসুন্দরীর তা জানাই হল না। আবছা আবছা মায়ের কথা মনে পড়ত, এই পর্যন্ত।

খাবাসপুর থেকে মন্দারগ্রাম মাইল পাঁচেকের পথ। উনিশ সনে সেখানে আমাদের বাড়ি উঠল। তার পাঁচ বছর বাদে আমার জন্ম।

॥ ৩ ॥

বাঁ পাশে রাজ্যের বাঁশ ফেড়ে ডাঁই করে রাখা হয়েছে, ডান পাশে মসৃণ কয়েকখানা বাখারি, সামনে একটা ক্ষতবিক্ষত কাঠের মুগুর। আগে ওই মুগুরের উপরে জাগীর-দাদা তামাক কাটত, এখন আর ওটা তার কাজে লাগে না। দায়ের আছাড়ি অর্থাৎ কাঠের-বাঁটকে সেই মুগুরের উপরে বারকয়েক বেশ আচ্ছা করে ঠুকে নিল জব্বার। নিজের মনেই বলল, "শালার দাও, আছাড়ির হোগা তোমার পছন্দ হয় না, ক্যামুন?" তারপর বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে, নতুন আর-একটা চেরা-বাঁশ টেনে নিয়ে, দা দিয়ে সেটাকে চেঁছে-ছুলে সাফ করতে লেগে গেল।

কাছারি-বাড়ির উঠোনের আর-এক দিকে বসে, যেভাবে চাটাই বোনে, যুধিষ্ঠির মণ্ডল সেইভাবে ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া বুনে যাচ্ছিল। বুনট শেষ করে জব্বারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "একবার এইদিকে আইসো মিঞা।"

মুখ না তুলেই জব্বার বলল, "ক্যান, আবার কোন্ কাম পড়ছে?"

"আরে চটো ক্যান্?" যুধিষ্ঠির হেসে ফেলল "বুড়া অইছি, সেই জুয়ান-বয়সের কুয়াদ তো আর নাই, আইসো, এই বেড়াখান্‌রে একবার ধরো দেহি, দুইজনে মিলা খাড়া কইরা ফেলাই।"

হাতের কাজ ফেলে জব্বার এগিয়ে এল। মাটিতে শোয়ানো বাঁশের বেড়াকে খাড়া করে, একটা নারকেল গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখল দুজনে। জব্বার জিজ্ঞেস করল, "আর কয়খান চটা লাগব মণ্ডল-ভাই?"

তৈরী বাখারিগুলোর দিকে একবার তাকাল যুধিষ্ঠির। মনে-মনে একটা হিসেব কষল। তারপর গামছা দিয়ে নিজের মুখখানাকে মুছে নিয়ে বলল, "এইবেলায় আর খান দশেক পাইলেই চইলা যায়।"

ঝড়ে আমাদের তিনখানা ঘর পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার নতুন করে সেগুলো তোলা হচ্ছে। খুঁটিগুলোকে নতুন করে বসানো হয়েছে; চালের কয়েকখানা টিন একেবারে দুমড়ে-বেঁকে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো পালটানো হয়েছে; এবারে বেড়াগুলোকে বসাতে পারলেই হয়। আইনদ্দী-কাকা কাজের তদারক করছে। লক্ষ্য রাখছে, বেড়ার বুনট যেন ঠাস-জমাট হয়, সেই-সঙ্গে টান করে, লাইন ঠিক রেখে বাঁধা হয় বাখারির ফ্রেম। বেড়ার গায়ে ফাঁক-ফোকর থাকা চলবে না; বাখারির লাইন ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে গেলে চলবে না; বেড়া এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে যখন চটাগুলোকে বাঁধা হবে, গুনা অর্থাৎ তারের বাঁধনে তখন কোথাও এতটুকু আলগা থাকলে চলবে না।

দুধ দুইয়ে জাগীর-দাদা ইতিমধ্যে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আইনদ্দী-

ক্যাকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বুড়াকর্তারে খুশী করা বড় শক্ত কাম। শহুইরা মানুষ, কিন্তুক আমাগো এই গেরাম-দ্যাশের কামও কিছু কম বুঝে না। বেড়ার বান্ধন এক্কেরে ন্যাড়-হাত অন্তর-অন্তর দ্যাওন লাগবো, ফাঁকি দিবার উপায় নাই।"

জাগীর-দাদা বলল, "হারে আইন্‌নদী, তুদের ই-সব বেড়া-উড়া কুছ্ কাম্‌কা নেহি। ফিন্ একবার তুফান হোবে তো ফিন্ ইসকো পটক্ দিবে। জলনধরমে ই-সব চোলে না। য়'হা এক্‌বার যাবি তো দেখতে পাবি, মকান্ কিস্‌কো বোলে। সমুচ্চা এক্‌দম বিলকুল পাক্কা।"

সেই কবে থেকে বাংলাদেশে রয়েছে, কিন্তু জাগীর-দাদা এখনও বাংলা বলতে ঠিক শিখল না। তার উপরে আইনদ্দী-কাকাকে বলে আইনন্‌দী, আর যুধিষ্ঠির-দাদাকে বলে যুধিষ্ঠিল্। শুনে যে আমার কী হাসি পায়, সে আর কী বলব। মধ্যের বাড়ির রাঙা-জ্যাঠামশাই আর টগর-কাকার সঙ্গে একবার বীরপুরের গঞ্জে গিয়েছিলুম; সেখানে যারা পাট কিনতে আসে, তাদেরও এইরকমের কাঁইমাই করে কথা বলতে শুনেছি। আবার জাগীর-দাদা এই যে কথায়-কথায় এত জলন্‌ধর-জলন্‌ধর করে, সেখানে নাকি কখনো ও ছিলই না। ঠাকুর্দা তো তা-ই বলেন। তাঁর কাছে শুনেছি. আমাদের এই বাংলাদেশের বাইরে বিহার বলে একটা মস্ত বড় জায়গা আছে, ওরা সেইখানকার লোক। খুব ছেলেবেলায় জাগীর-দাদা তার বাবার সঙ্গে বর্ধমানে এসেছিল। আসলে আসবার কথা ছিল কলকাতায়, কিন্তু বর্ধমানকেই কলকাতা ভেবে রেলগাড়ির থেকে নেমে পড়ে। জাগীর-দাদার বয়স তখন এক বছরের বেশী নয়। তা বর্ধমান থেকে ওরা ঘুরতে-ঘুরতে আসে মানকরে। বাস্, সেই থেকেই ওরা ঠাকুর্দাদের সঙ্গে রয়ে যায়। ওর বাবা আর মা নাকি ঠাকুর্দাদের সঙ্গে যশোরে পোঁছেই ওলাউঠোয় মারা গিয়েছিল, ওরও আর বিহারে ফেরা হয়নি। তা হলে ও হিন্দী শিখল কোত্থেকে? ঠাকুর্দা বলেন, "দূর দূর, ওকে হিন্দী বলে নাকি, এখন যদি ও বেহারে ফেরে তো ওর 'দেশোয়ালী' ভাইরা ওর কথাই বুঝবে না।" জাগীর-দাদা সকালবেলায় ভিজে-ছোলা খায়। কিন্তু দুপুরে ডাল-রুটি খায় না। রাত্তিরেও না। আমি যেমন মাছের ঝোল আর ভাত খাই, জাগীর-দাদাও তেমনি মাছের ঝোল আর ভাত খায়। তবু যে কেন কাঁইমাই করে কথা বলে, বুঝি না। এত জলন্‌ধরের কথাই বা বলে কেন? ঠাকুর্দা বলেন, "বুড়ো হলি, তবু তোর চালবাজি গেল না। আরে ব্যাটা, সিঙ্গি হলেই যদি পান্‌জাবী হতো, তবে তো আমাদের কালী সিঙ্গিও মস্ত পান্‌জাবী!"

আমাদের নৌকোখানাকে ডাঙায় তুলে, উপুড় করে, আলকাতরা মাখিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। নইলে নাকি কাঠ পচে যায়। নৌকোর পাশেই আমাদের পেয়ারা-গাছ। পেয়ারাগাছের কাঠ খুব শক্ত। তার একটা ডালের জোড়ের জায়গায় কেটে নিয়ে ছুরি দিয়ে আমি ছাল-বাকলাগুলোকে পরিষ্কার করছিলুম। এই দিয়ে একটা গুলতি বানাতে হবে। নিমাই-দাদা সেদিন গুলতি দিয়ে

একটা দোয়েল মেরেছে, কিন্তু দোয়েল তো খুব সুন্দর পাখি, কারুর কোনো অনিষ্টও করে না, তাই আমার দোয়েল মারবার ইচ্ছে নেই। আমি একটা দাঁড়কাক মারব। আমাদের এ-দিকে পাতিকাকই বেশী, দাঁড়কাক বড় একটা আসে না। কিন্তু ঝড়ের পরদিন থেকে একটা দাঁড়কাক এসে জুটেছে। মাঝে-মাঝেই রান্নাঘরের বারান্দায় এসে বসে আর হেঁড়ে গলায় ক্ব-ক্ব করে। ওটাকে ঠিক মারব। কাল আমি কাদামাটি দিয়ে গুলি পাকিয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে রেখেছি। এখন একটা গুলতি চাই। রবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উত্তরের-বাড়ির জ্যাঠামশাইদের একটা পুরনো বুক-দেখা যন্তর আছে, তার নলের রবারটাকে কেটে নিলেই চলবে। গুলতিতে সেই রবার লাগিয়ে—দাঁড়াও, পাজী দাঁড়কাককে আমি মজা দেখাচ্ছি, ব্যাটাকে আর ঘাড় বাঁকিয়ে ক্ব-ক্ব করতে হবে না।

পেয়ারা-গাছের ডালটাকে চেঁছে-ছুলে সাফ করতে করতে এইসব কথাই আমি ভাবছিলুম। একই সঙ্গে শুনে যাচ্ছিলুম জাগীর-দাদার কথা। এমন সময় মেঘু এল। ছুটতে-ছুটতে এসেছে। হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে-হাঁফাতেই বলল, "অমু, শিগগির আয়, নিস্তার-বাগে এট্টা শজারু বাইরাইছে।"

জাগীর-দাদা ইতিমধ্যে পুকুরের ধারে ঠাকুর্দার জন্যে একটা জলচৌকি পেতে দিয়েছিল। তিনি কখনও পুকুরে নেমে চান করেন না। তাঁর জন্যে রোজ কয়েক বালতি জল তুলে দেওয়া হয়। জলচৌকিতে বসে, বালতির মধ্যে ঘটি ডুবিয়ে তিনি মাথায় ঢালেন। তখন বলেন, "গঙ্গা গঙ্গা।" চটি পায়ে ভিতর-বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে অমলাংশুবাবু, এই রোদ্দুরে এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

কিন্তু আমার আর তখন ঠাকুর্দার কথায় কান দেবার মতন সময় নেই। মেঘুর হাত ধরে আমি নিস্তার-বাগের দিকে ছুট্ লাগালুম।

গিয়ে দেখি তুমুল কাণ্ড। রাজ্যের লোক সেখানে জড় হয়েছে। আমাদের এ-পাড়ার লোকজন তো আছেই, দত্ত-পাড়ারও অনেককে সেখানে দেখলুম। মজুমদার-বাড়ির কালাদা একটা লাঠি নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। আমাদের দেখে বলল, "তরা পোলাপানরা এইহানে আইছিস ক্যান্?" সিকদার-বাড়ির ফটিক-কাকা দেখলুম মস্ত একটা সড়কি নিয়ে এসেছে। মেঘু বলল, ফটিক-কাকার খুব সাহস। আমি কিছু বললুম না। আমার মনে হল, আমারও একটা সড়কি থাকলে ভাল হতো। আজই গিয়ে আইনদ্দী-কাকাকে বলতে হবে।

নাপিত-বাড়ির বিলাস-দাদাও সেখানে ছিল। রোজ সকালে বিলাস-দাদা গিয়ে ঠাকুর্দাকে 'খেউরি' করে দেয়। আজ কিন্তু যায়নি। ভাগ্নেকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, জ্বর হয়েছে, কয়েকটা দিন যেতে পারবে না। এখন তাকে ঝপ্ করে একটা কলাগাছ কেটে, সেই কলাগাছের কাণ্ডটাকে দু' হাতে তুলে নিয়ে "সইরা যাও, সইরা যাও" বলে একটা ঝোপের দিকে এগোতে দেখে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, "ও বিলাস-দাদা, খুব তো জ্বর হইছে বইলা আইজ

আমাগো বাড়ি গেলা না, এহোন দেহি কলাগাছ নিয়া শজার মারতে আইছ?”

কিন্তু সে-কথা বলবার আগেই দেখি ঝোপের ভিতর থেকে মস্ত একটা শজারু বেরিয়ে এসেছে। ফটিক-কাকা তৎক্ষণাৎ সড়কি ছুঁড়ে মারল। ভেবেছিলুম যে, এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে। তা কিন্তু হল না। একটুর জন্যে ফসকে গেল সড়কিটা। সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে একটা সিঁদুরে আম-গাছের মধ্যে গেঁথে গেল। ফটিক-কাকা সেটাকে টেনে বার করতে দেখা গেল যে, তার ফলাটা বেঁকে গেছে।

শজারুটা ইতিমধ্যে এক-পিঠ কাঁটা উঁচিয়ে দৌড়ে গিয়ে পাশের আর-একটা আশ-শ্যাওড়ার ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে। চতুর্দিক থেকে ঢিল পড়ছে, বাঁশ দিয়ে ঝোপের মধ্যে খোঁচাও মারছে কেউ-কেউ—একটু বাদেই তাকে আবার বেরিয়ে আসতে হল। বেরিয়েই আর-একটা ঝোপের দিকে দৌড় মেরেছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে আর পেঁছতে পারল না, তার আগেই দেখলুম, বিলাস-দাদার কলাগাছ তার পিঠের উপরে গেঁথে গেছে। বাস্, আর তার নড়বার-চড়বার উপায় নেই।

নিস্তার-বাগেই সেটাকে পিটিয়ে মারা হল। মারবার আগে বিলাস-দাদা সবাইকে বলে দিয়েছিল, “খবদার, লইখ্য রাইখো, কাঁটাগুলান য্যান ভাঙ্গে না।” তারপর ফটিক-কাকার দিকে তাকিয়ে: “সড়কি দিয়া শজারু মারবার আইছেন, ক্যামুন মানুষ আপনে? শজারু আর বাগডাসা কি এক বস্তু?”

ফটিক-কাকা তাই শুনে “হারামজাদা, তুমি আমারে চোখ রাঙাইয়া কথা কও, তোমারে আইজ শ্যাষ কইরা ছাড়ছি” বলে তার ভোঁতা সড়কি নিয়েই লাফ দিয়ে বিলাস-দাদার দিকে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু অন্যেরা এসে মাঝখানে পড়ে তাকে থামিয়ে দিল, ফলে ফটিক-কাকা আর বিলাস-দাদার মধ্যে কে যে বেশী পালোয়ান, তা আর আমাদের জানা হল না।

ছাল ছাড়িয়ে কেটে-কুটে শজারুর মাংস ইতিমধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হচ্ছিল। আমারও যে লোভ হচ্ছিল না, তা নয়, কিন্তু শজারুর মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরলে পাছে ঠাকুর্দা খুব বকাবকি করেন, এই ভয়ে আর চাওয়া হল না। কিন্তু কাঁটা নিলে তো আর দোষ নেই, তাই বিলাস-দাদার কাছ থেকে দুটো কাঁটা চেয়ে নিলুম। পুজোর সময়ে দিদি আর ছোট-পিসি বাড়ি আসবে, তখন তাদের দেব।

বাড়ি ফিরে ঠাকুর্দাকে বললুম, “দাদু, আইজ নিস্তার-বাগে এট্টা শজারু মারছি।”

ঠাকুদা তখন লিচুতলায় পাতা তক্তাপোষে বসে, তামাক খেতে খেতে, একটা দলিল দেখছিলেন। আমার দিকে না-তাকিয়েই বললেন, “বটে? মাংস কোথায়?”

শুনে তো আমি হতভম্ব। ভদ্দরলোকেরা আবার শজারুর মাংস খায় নাকি?

ঠাকুর্দাকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে, মুখ না তুলেই, একগাল হেসে তিনি

বললেন, "তোমার ঠাকুমা খান না। তোমার বাপ-কাকারাও খান না। কিন্তু আমি খাই। মানে কখনও খাইনি বটে, তবে পেলে খাই। বুঝলে অমলাংশুবাবু, শজারু নেহাত যে-সে বস্তু নয়। সংস্কৃতে তার নাম হচ্ছে শল্লকী। তার মাংস অতি সুস্বাদু।" তারপর একটু থেমে বললেন, "তোমার বাবা তো একজন মস্ত পণ্ডিত ; তা এবারে পুজোর ছুটিতে যখন দেশের বাড়িতে আসবেন, তখন একবার জিজ্ঞেস কোরো তো শল্লকী কথাটার মানে জানেন কিনা।"

আমি কিছু বলছিলুম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। ঠাকুর্দা আমার নীরবতার কারণটা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন, তাই দলিলটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে, মুখ তুলে, তীব্র চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "কী রে শালা, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যেই একবার বাবার কথা বলেছি, অমনি বুঝি তোর মন খারাপ হয়ে গেল?"

একমাত্র জাগীরা-দাদা ছাড়া ঠাকুর্দা আর কাউকে কক্ষনো 'তুই' বলেন না। বাবাকে বলেন না, কাকাদের বলেন না, পিসিমাদের বলেন না; এমন কী, আমাকে যে এত ভালবাসেন, আমার খাওয়া হয়ে যাবার পরেও রোজ দুবেলা তাঁর পাতে বসিয়ে সবরি-কলা দিয়ে দুধ-ভাত মেখে আমাকে খাইয়ে দেন, তবু আমাকেও সর্বদা 'তুমি' বলেন। অন্যেরা আমাকে 'অমু' বলে, ঠাকুর্দা বলেন 'অমলাংশুবাবু'। "এই যে অমলাংশুবাবু, গড়গড়াটা একটু এগিয়ে দাও তো ভাই", "এই যে অমলাংশুবাবু, তোমার ঘুম তাহলে ভেঙেছে", "ব্যাপার কী অমলাংশুবাবু, সারাটা দিন ছিলে কোথায়"—এইরকম সব কথা।

আজ কিন্তু 'তুই' বললেন। হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে, তক্তাপোষে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, বাবার কাছে যাবি? ঠিক আছে, এবারে তোকে তোর বাবার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব, কেমন?"

আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। এক-এক সময়ে এই রকম হয়। ভীষণ কান্না পায়। কিন্তু কেন যে পায়, তা আমি বুঝতে পারি না। খিদে নেই, কেউ আমাকে বকাঝকা করেনি, জামগাছের মটকা ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে পা মচকায়নি—তবু ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট হতে থাকে। আজও হচ্ছিল। সবচাইতে কষ্ট হচ্ছিল ঠাকুর্দার দিকে তাকাতে।

মাথা নিচু করে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিলুম আমি; তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, ডালিমগাছে বসে একটা পাখি অনেকক্ষণ কুর্‌র্‌-কট কুর্‌র্‌-কট করে শব্দ করে যাচ্ছিল, হাতের ঢেলাটাকে সেইদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, "না দাদু, আমি কোথাও যাব না।"

সত্যিই কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করে না। আমাদের এই দেশের বাড়িই আমার পছন্দ। এখানে সব্বাইকে আমার ভাল লাগে। ঠাকুর্দাকে ভাল লাগে, ঠাকুমাকে ভাল লাগে, বড়-কাকীমাকে ভাল লাগে, জাগীর-দাদাকে ভাল লাগে, আইনদ্দী-কাকাকে দারুণ ভাল লাগে। তা ছাড়া, কলকাতার বাড়িতে কি নৌকো আছে? পুকুর আছে? সিঁদুরে আমগাছ আছে? বড়-কাকার সঙ্গে কলকাতায়

গিয়েছিলুম। একটুও ভাল লাগেনি। সেখানে সবাই শুধু বকাঝকা করে।

এক ওই বাবা ছাড়া। বাবা খুব ভাল। বাবা আমাকে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, জাহাজ দেখিয়েছিলেন, সেখান থেকে মস্ত একটা মাঠে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে সাহেবদের ফুটবল-খেলা দেখলুম, খেলার শেষে একটা বাগানে গিয়েছিলুম. সেই বাগানে অনেক ফুল, আর মধ্যিখানে একটা উঁচুমতো জায়গা, সেইখানে দাঁড়িয়ে রঙচঙে পোশাক পরে কারা যেন বিলিতী বাঁশি আর গড়ের বাদ্যি বাজাচ্ছিল. বাবা বললেন—ব্যান্ড বাজাচ্ছে। তারপর ফিরতি পথে হগসাহেবের বাজার থেকে বাবা আমাকে একটা তিন-চাকার সাইকেল কিনে দিলেন। কিন্তু যেই না বাড়ি ফিরেছি, কোথায় একটু ছাতে গিয়ে সাইকেল চালাব, তা নয়, মা অমনি বললেন, "দেশের বাড়িতে থেকে থেকে আমার এই ছেলেটা একেবারে গো-মুখখু হয়ে গেল। পড়াশুনোর নাম নেই, সারাটা দিন খালি খেলা আর খেলা।"

বাবা কিন্তু খুব ভাল। কখনো কাউকে বকেন না। মাকে বললেন, "আহা অত বকাবকি করছ কেন? দু' দিনের জন্যে একটু বেড়াতে এসেছে, আর অমনি তোমার শাসন শুরু হয়ে গেল।"

সেই রাত্তিরে বাবা আমাকে পার্সিয়ুসের গল্প বলেছিলেন। আরও অনেক গল্প নিশ্চয় বলতেন। কিন্তু বাবা তো খুব ব্যস্ত মানুষ, কত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে, কত জায়গায় তাঁকে যেতে হয়, তাই একদম সময় পান না। আমারও তাই আর গল্প শোনা হয়নি। বাবা আমাকে আদর করে বলেন 'ন্যাওটা'। রোজ সকালে কলেজে যাবার সময় বলতেন, "ন্যাওটা, আজ রাত্তিরে যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারি তো খুব মজার একটা গল্প বলব।" কিন্তু ফেরা হতো না। যখন ফিরতেন, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

মা সেই বারেই ঠিক করেছিলেন যে, আর আমাকে দেশে ফিরতে না দিয়ে ইশকুলে ভর্তি করে দেবেন। ভাগ্যিস আমার ঘুরে-ঘুরে জ্বর হতে লাগল। ডাক্তারবাবু বললেন, "কলকাতায় এসে ম্যালেরিয়া বাধিয়েছে দেখছি।" বাবা বললেন, "এখানে ওর শরীর টিকবে বলে তো মনে হয় না। থাক, সুখের থেকে সোয়াস্তি ভাল, ন্যাওটাকে বরং ওর ঠাকুর্দার কাছেই পাঠিয়ে দাও।"

দেশে ফিরেও দিন কয়েক খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলুম। সন্ধে হলেই কাঁপিয়ে জ্বর আসত। বীরপুরের গঞ্জ থেকে আইনদ্দী-কাকাকে দিয়ে ঠাকুর্দা এক বোতল ডি গুপ্তের ওষুধ আনিয়ে দিলেন। ওঃ, সে যে কী তেতো ওষুধ. সে আর কী বলব। তাই খেয়ে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠলুম। এখন আর আমার জ্বর আসে না। সারাটা দিন নেউল আর মেঘুর সঙ্গে খেলে বেড়াই। তিন-চাকার সেই সাইকেলটার জন্যে অবশ্য খুব দুঃখ হয়। কিন্তু ঠাকুমা আমাকে পেতলের কলসি জাপটে ধরে সাঁতার কাটতে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেও খুব মজার ব্যাপার। এখন আমি রোজ অনেকক্ষণ সাঁতার কাটি। তা ছাড়া, বাবা বলেছেন যে, পুজোর ছুটিতে দেশে আসবার সময় সাইকেলটাও নিয়ে আসবেন।

পুজোর আর ক' মাস বাকী? ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে, নিশ্চয় ভাববেন যে, বাবার জন্যে আমার মন কেমন করছে, তাই জাগীর-দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। জাগীর-দাদা বলল, "অওর চার মাহিনা।" তার মানে চার মাস। তার মানে এখনও অনেক...অনেক দিন।

আসলে দিনের বেলাটা এখানে আমার ভালই লাগে, কিন্তু সন্ধে হলেই অমনি মন খারাপ হয়ে যায়। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। এই তো সেদিন রাত্তিরবেলায় ঠাকুর্দার জন্যে হামানদিস্তেয় পান ছেঁচতে ছেঁচতে ঠাকুমা হঠাৎ ছেঁচুনিটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, "শুনলা?"

ঠাকুর্দা বললেন, "কী?"

"ছেঁচুনিডা তুইলা নেবার পরেও এট্টা শব্দ হইল। উপর-ঘরে মনে লয় লোক আইছে, পান-ছেঁচুনির শব্দের সঙ্গে তাল দিয়া দরজায় ধাক্কা মারতেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাতে লাগলুম আমি। "ও জাগীর-দাদা, ও টগর-কাকা, ও রাঙ্গা-জ্যাঠামশাই, শিগগির আইসো, চোর আইছে!"

হ্যারিকেন আর লাঠি নিয়ে সবাই ছুটে এলেন। কিন্তু দোতলার টিনের চাল থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে চোর ততক্ষণে পালিয়েছে। সে-রাত্তিরে আর আমার ঘুমই হল না। পরদিন সকালে উঠে দেখলুম, সারা উঠোনে মাছের কাঁটা আর ভাত ছড়ানো। ঠাকুর্দা বললেন, "ও, এইজন্যেই কাল কুকুরের ডাক শুনতে পাইনি! ব্যাটারা দেখছি মহা ধুরন্ধর।"

চোরের ভয় করে। ভূতের ভয় করে। তা ছাড়া আমাদের বেলে-আমগাছে একটা প্যাঁচা এসে বাসা বেঁধেছে। রাত্তিরে সেটার হুম্-হুম্ ডাক শুনলে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। এইসব কারণে সন্ধে হলেই আমি একটু দমে যাই। টিনের চালে পায়রাগুলো তখন নখ আঁচড়ায়। চালের নীচে কাঠের বাতার উপরে মস্ত মস্ত ইঁদুর দৌড়ে বেড়ায়। সেই ইঁদুরগুলোকে তাড়া করতে গিয়ে একটা সাপ সেদিন বাতার থেকে ঝুপ করে আমাদের বড়ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গিয়েছিল। জাগীর-দাদা অমনি লাঠি উঁচিয়ে মারতে গেল, কিন্তু ঠাকুমা তার লাঠি কেড়ে নিয়ে বললেন, "বাস্তুসাপ! মারতে নাই, মারলে অমঙ্গল হয়।" ঠাকুর্দা বললেন, "ধুৎ, যত্ত সব কুসংস্কার।" কিন্তু সাপটা যে ইতিমধ্যে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

বড়ঘরের উত্তর-পুব কোণে ঠাকুর্দার খাট, তার ঠিক সামনে অর্থাৎ দক্ষিণ-পুব কোণে পাতা মস্ত বড় ছাপর-খাটে, ঠাকুমার কোলের কাছে, গুটিসুটি মেরে আমি শুয়ে আছি। বড়-কাকীমাও রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে ঠাকুমার ও-পাশে এসে শুয়ে পড়লেন।। ঠাকুর্দা এতক্ষণ লণ্ঠনের আলোয় একটা বই পড়ছিলেন। এইবারে বইয়ের মধ্যে একটা পালক রেখে, লণ্ঠনের সলতেটাকে নামিয়ে দিতেই ঘরের চেহারা হঠাৎ পালটে গেল। আলো আর অন্ধকারের জায়গা আর সীমানার অদল-বদল ঘটে গেল। মেঝের উপরে ঠাকুর্দা যেখানে লণ্ঠনটাকে নামিয়ে রাখলেন, শুধু সেইখানে, লণ্ঠনটা ঘিরে, এখন ছোট্ট একটা আলোর

বস্তু দেখতে পাচ্ছি। বাদবাকী সব জায়গায় অন্ধকার।

ঘুমোবার আগে ঠাকুর্দা রোজ বলেন, "মঙ্গল হোক, সকলের মঙ্গল হোক।" আজও বললেন। অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে এই সময়ঃ হো—ও-ও-ও-ও-ও। আজও এল। চৌকিদারের ডাক। এই সময় রোজ একবার গ্রামের লোকদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে যায়। এক ঘুম দিয়ে উঠবার পর মাঝরাত্তিরে আবার ওই ডাক শুনতে পাব। পশ্চিমের বড় পুকুরের দিক থেকে একেবারে অন্য রকমের আর-একটা শব্দ মাঝে-মাঝে ভেসে আসতে থাকে। গুব্-গুব্-গুব্-গুব্। আমি জানি যে, ওটা ডাহুকের ডাক। তবু কেমন যেন ভয়-ভয় করে।

ঠাকুর্দা ঘুমোচ্ছেন। ঠাকুমা ঘুমোচ্ছেন। বড়-কাকীমাও অনেকক্ষণ হল ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি ভাবছিলুম যে, শজারু যখন ছুটে বেড়ায়, তখন ঝমঝম করে একটা শব্দ হয়। শজারুর সংস্কৃত নাম শল্লীক। না না, শল্লীক নয়, শল্লকী। বাবা এলে বলতে হবে।

ঠিক এই সময়ে আমাদের দরজায় কে যেন দারুণ জোরে ধাক্কা দেয়। "ঠাউর-দাদা, ও ঠাউর-দাদা!"

ধড়মড় করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসি। ঠাকুমা আর বড়-কাকীমারও ঘুম ভেঙে যায়। খাটের থেকে নীচের দিকে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের সলতেটাকে উসকে দিয়ে ঠাকুর্দাও বলেন, "কে? কে ডাকে?"

বাইরে থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসে।

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ঠাকুমা বলেন, "মল্লিক-বাড়ির যমুনা বইলা মনে হয়।"

আমিও তখন সাহস পেয়ে ঠাকুমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। আবছা-জ্যোৎস্নায় দেখতে পাই যে, হ্যাঁ, যমুনা-দিদিই বটে।

দরজা খুলে দিতেই যমুনা-দিদি এসে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ে। এতক্ষণ সে বাইরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, এবারে ভীষণভাবে চেঁচিয়ে উঠে বলে, "ও ঠাউর-দাদা, একবার আইসো, তোমাগো জামাইর কাণ্ডটা একবার দেইখা যাও!"

চুল এলোমেলো, সিঁদুরের টিপ লেপটে গিয়ে গোটা কপালটাই লাল দেখাচ্ছে, মাটির মেঝের উপরে পাগলের মতো মাথা ঠুকতে থাকে যমুনা-দিদি, আর বলতে থাকে, "একবার দেইখা যাও ঠাউর-দাদা, একবার দেইখা যাও!"

॥ ৪ ॥

লোকেশ্বর ও চিত্তসুন্দরীর দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের হয়েছিল। বড় হয়ে মায়ের কাছে শুনেছি, তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ীর মধ্যে কখনও কোনও বড় রকমের মতদ্বৈধ তিনি ঘটতে দেখেননি। যেন তাঁরা ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে, মতান্তর ঘটলেও তাকে তাঁরা বেশী দূর গড়াতে দেবেন না, সমস্যাগুলোকে নিঃশব্দে মিটিয়ে নেবেন। আমরাও দেখেছি, সাংসারিক কোনও ব্যাপারে ঠাকুর্দার যাতে বিন্দুমাত্র অসন্তোষের কারণ না ঘটে, ঠাকুমা সেদিকে সদা-সর্বদা তীক্ষ্ন নজর রাখতেন। ঠিক তেমনি, ঠাকুমার যখন জ্বরজারি হতো কিংবা তাঁকে একটু গম্ভীর দেখাত, ঠাকুর্দার তখন উদ্বেগের সীমা থাকত না। একজনের এই বিবেচনা এবং অন্যজনের এই উদ্বেগ—তখন বুঝতে না-পারলেও আজ বুঝতে পারি যে, এ-সব জিনিস আসলে ভালবাসার থেকেই জন্ম নেয়। সন্দেহ নেই, পরস্পরকে তাঁরা ভালবাসতেন।

কিন্তু তাতে এইটেই মাত্র প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের দুটি নরনারীর পক্ষেও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং পরস্পরকে ভালবেসে সুখী হওয়া সম্ভব। লোকেশ্বর ও চিত্তসুন্দরীর চরিত্রে আসলে তিলপরিমাণ মিল ছিল না।

ঠাকুর্দা ছিলেন হিসেবী মানুষ। ঠাকুমা সেক্ষেত্রে খর্চে-স্বভাবের মহিলা ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে জন্মেছিলেন, তাই—সচ্ছল পরিবারের একমাত্র কন্যা হওয়া সত্ত্বেও—বিলাসী হবার সুযোগ তিনি পাননি ; কিন্তু অন্যদিকে, দৈনন্দিন খরচ-খর্চা, অর্থাৎ চাল-ডাল-তেল-নুন-মাছ-তরকারির ব্যয়বরাদ্দেও যে একটু হাত টান করে চলবার দরকার হতে পারে, হয়, তা যেন তাঁর ধারণার মধ্যেই ছিল না। ঠাকুর্দা বলতেন, টিনের থেকে যখন কেরাসিন ঢালবে, তখন একটা ফাঁদল লাগিয়ে নিলে ভাল হয়। ঠাকুমা ও-সব ফাঁদল-টাদলের ধার ধরতেন না, সরাসরি টিনের থেকে লণ্ঠনের মধ্যে তেল ঢালতেন। ফলে কিছুটা তেল মাটিতে পড়ে নষ্ট হতো। ঠাকুর্দা বলতেন, এটা অপচয়। ঠাকুমা বলতেন, সব ব্যাপারে অত টিকটিক করতে নেই, সংসার করতে গেলে অমন একটু-আধটু অপচয় হয়েই থাকে।

ঠাকুর্দার হাসি ছিল একটু চাপা ধরনের। কেউ কোনও মজার কথা বললে তাঁর মুখের উপরে অল্প-একটু কৌতুকের ছটা ঝিলিক দিয়ে উঠত, এই পর্যন্ত ; কখনও তাঁকে হো-হো করে হাসতে দেখিনি। ঠাকুমার হাসি কিন্তু, ভরা-বর্ষার প্লাবনের মতো, তাঁর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত এবং লহরে-লহরে

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। ঠাকুর্দার রাগও ছিল চাপা। এমনিতেই ছিলেন রাশ-ভারী মানুষ, রাগলে আরও গম্ভীর হয়ে যেতেন। চুপচাপ বসে চিবুকে একটা আঙুল ঘষছেন, স্রেফ এই দেখেই আমরা বুঝে যেতুম, ঠাকুর্দার মেজাজ এখন মোটেই ভাল নয়। ঠাকুমার ওদিকে রাগলে আর কোনও জ্ঞানই থাকত না। যাকে যা নয়, তা-ই তার মুখের উপরে বলে দিতেন।

সাধারণ কথাবার্তাতেও দুজনের বৈষম্য কারও চোখ এড়াত না। ঠাকুমার গলার স্বরই ছিল একটু চড়া পর্দায় বাঁধা ; আর ঠাকুর্দা কথা বলতেন নিচু গলায়, ধীরে-সুস্থে। কিন্তু গলা যতই নিচু হোক্, তাতে দৃঢ়তা যে কিছু কম থাকত, তা নয়। বরং একটু বেশীই থাকত। সেই কারণে তাঁকে আমরা ভয়ও করতুম। অন্যদিকে, ঠাকুমা যদিও সব ব্যাপারেই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কথা বলতেন, কেউ কখনও তাঁকে ভয় করেছে বলে শুনিনি। যখন রেগে যেতেন, তখন অবশ্য অন্য কথা।

অমিল ছিল তাঁদের ভাষাতেও। ঠাকুমা সেই কবে বালিকা-বয়সে কলকাতায় গিয়েছিলেন, তারপরে একনাগাড়ে পঁয়ত্রিশ বছর সেখানে কাটিয়ে দিলেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও তিনি বাপের বাড়ি আসেননি, তবু, আশ্চর্য, কলকাতার ভাষাটা তাঁর কখনও রপ্ত হল না। তা নিয়ে কোনও সংকোচও তাঁর ছিল না। সিমলে-পাড়ার বাঙাল-বউটি শুনেছি অকুতোভয়ে সেখানে বাঙাল ভাষাতেই কথা বলতেন। অন্য দিকে, ঠাকুর্দা বাঙাল-দেশে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর পুত্রকন্যাদের প্রত্যেকের জন্য বাঙাল-দেশ থেকে বধূ ও জামাতা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং নিজেও এসে শেষ জীবনটা বাঙাল-দেশেই কাটিয়েছিলেন, তবু শ্বশুরবাড়ির ভাষা সম্পর্কে তিনি কখনও কোনও আকর্ষণ বোধ করেননি। পূব-বাংলার সেই 'পাণ্ডববর্জিত' গ্রামের মধ্যেও একেবারে চোস্ত, চাঁচাছোলা কলকাতার উচ্চারণে তিনি কথা বলতেন। তাঁর পুত্রকন্যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বিভাষী। অন্য সময়ে 'পিতৃভাষা'য় কথা বললেও দেশের বাড়িতে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁরা 'মাতৃভাষা'তেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ঠাকুর্দা যে এই ব্যাপারটাকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন, এমন আমার মনে হয় না। মুখে তিনি বলতেন বটে যে, ভাষা তো আসলে একই, ওই শুধু উচ্চারণটাই যা একটু আলাদা, কিন্তু সেটা কথার কথা, নিজেরই বাড়িতে নিজেরই ছেলেপুলের মুখে যে একটা আলাদা রকমের উচ্চারণ শুনতে হচ্ছে, এতে বোধ হয় তাঁর অহংকার কিছুটা আহত হতো। খুব সম্ভব তাঁর আশা ছিল যে, নাতিটি অন্তত পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখাবে। সেই আমার মুখেও যখন অনর্গল বাঙাল-ভাষার খই ফুটতে লাগল, তখন তিনি খুব দুঃখ করে একদিন বলেছিলেন, "দাদু, বাড়িতে যেমন তোমার ঠাকুমা রয়েছেন, তেমনি আমিও তো আছি। তা ওঁর কথাটা না-নিয়ে তুমি আমার কথাটাও তো নিতে পারতে।"

চেহারার অমিলটাই সবচাইতে প্রকট হয়ে চোখে পড়ত। লোকেশ্বর ছিলেন খর্বকায় মানুষ। আর চিত্তসুন্দরী ছিলেন রীতিমত দীর্ঘাঙ্গী। তাঁদের দুজনকে

কখনও পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখা হয়নি, কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়ালে ঠাকুমার মাথা যে ঠাকুর্দার মাথাকে ছাড়িয়ে যাবে, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। মা বলতেন, দূর দূর, তাই আবার হয় নাকি, মেয়েদের যতই লম্বা দেখাক, পুরুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই ধরা পড়ে যায় যে, আসলে তারা সত্যিই এমন-কিছু লম্বা নয়। আমার কিন্তু সে-কথা বিশ্বাস হতো না। তক্কে তক্কে থাকতুম, ঠাকুর্দা কখন খাট থেকে নামেন আর ঠাকুমা এসে তাঁর চটিজোড়াকে সামনে এগিয়ে দেন। ঠাকুর্দা আমার মতলবটা ঠিক টেরও পেয়ে গিয়েছিলেন। চটিজোড়াকে ঠিক করে রেখে ঠাকুমা যতক্ষণ না অন্য কাজে যাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি খাটের থেকে নামতেন না। চুপচাপ বসে একটা সাতবাসী খবরের কাগজের পাতা ওলটাতেন। অধৈর্য হয়ে একদিন বলেছিলুম, "দাদু, অত দেরি করতেছ ক্যান্? তাড়াতাড়ি নাইমা তোমার জুতা পরো।" তাতে, কাগজ থেকে মুখ না তুলেই, তিনি বললেন, "কেন হে অমলাংশুবাবু, এত তাড়া কিসের?" তারপর, কাগজ থেকে মুখ তুলে, আমার দিকে তাকিয়ে: "বর বড়, না কনে বড়, সেইটে না জানা পর্যন্ত বুঝি শান্তি হচ্ছে না?"

ঠাকুমা চটপট সেখান থেকে সরে গেলেন। তাঁর রঙ তো ধপধপে ফর্সা; আমার মনে আছে, ঠাকুর্দার কথা শুনে তাঁর মুখ নিমেষে লাল হয়ে উঠেছিল।

রঙের কথায় বলি, ঠাকুর্দার রঙ ছিল ঘনকৃষ্ণ। খুব সম্ভব আগেও সে-কথা বলেছি। আর ঠাকুমার মতন অমন ফর্সা রঙ অন্তত বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বড়-একটা চোখে পড়ে না। মা-কাকীমারা আড়ালে-আবডালে বলতেন 'মেমসায়েব'। খুব একটা যে বাড়িয়ে বলতেন, তা নয়। অত যে খাটাখাটুনি করতেন ঠাকুমা, দুপুর-রোদেও গোটা-বাড়িটাকে বারবার চক্কর দিয়ে আসতেন, তবু, এমন-কী, বুড়ো বয়সেও তাঁর রঙ এতটুকু জ্বলে যায়নি। তখনও তাঁর দিকে তাকালে মনে হতো যেন একটি শ্বেতপাথরের মহিমা আমাদের উঠোনের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মায়ের রঙ কালো, কিন্তু দুই কাকীমা তো খুবই ফর্সা, কিন্তু তাঁরাও অনেক সময় নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে বলতেন, "এই সব বাড়িতে বউ হইয়া আসা বড় বিপদের ব্যাপার। যে দ্যাখে, সে-ই কয়, 'হ বউ তো ফর্সাই হইছে, তয় কিনা শাশুড়ীর পাশে কিছু না।'"

শুধু রঙ বলেই বা কথা কী, মুখশ্রীও ছিল অসামান্য। যেমন নাক, তেমনি চোখ, চিত্তসুন্দরী যে সত্যিকারের রূপসী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। জমিদারবাড়ির গিন্নী হলেই তাঁকে মানাত ভাল। তা নয়, তিনি এমন মানুষের হাতে পড়লেন, পেটের ভাত আর পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতেই যাঁকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এমনটা যে কী করে ঘটল, ভেবে আমি কূলকিনারা পাই না। একমাত্র মেয়ে, তার উপরে আবার অমন রূপসী মেয়ে, আত্মীয়বান্ধবহীন অসচ্ছল এক অনাথ বালকের হাতে কী করে তাকে সমর্পণ করলেন রামজয় গঙ্গোপাধ্যায়? কী করে তাকে দূর প্রবাসে পাঠিয়ে দিতে পারলেন? তাঁর মনে কি স্নেহ-মায়া-মমতা বলতে কিছু ছিল না? নাকি লোকেশ্বরকে তাঁর এতই ভাল লেগে গিয়েছিল

যে, অন্য আর কোনও কিছুর কথাই তিনি ভাবতে চাননি? এ তো প্রায় নির্বাসনে পাঠাবার মতো ব্যাপার। রামজয় কি ধরেই নিয়েছিলেন যে, সেই নির্বাসিত জীবনও তাঁর কন্যার পক্ষে খুব অ-সুখের হবে না? অনুমান করতে পারি, রামজয় ছিলেন সেই রকমের মানুষ, যাঁরা ঝোঁকের মাথায় এক-একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, এবং সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে যে কোনও ভুল থাকতে পারে, এমন কথা যাঁদের মনেই হয় না। কিন্তু তাঁর স্ত্রীও তো তখন জীবিত। তিনিই বা এই বিয়েতে রাজী হলেন কী করে? তিনি তো খুব ভালই জানতেন যে, জীবনে আর কখনও হয়ত মেয়েকে তিনি দেখতে পাবেন না। তবে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিতে পারতেন, সেই দুজনের কেউই আজ আর বেঁচে নেই। যখন ছিলেন, তখন এ-সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়সই আমার হয়নি। শুধু আবছা-আবছা বুঝতে পারতুম যে, মা-বাবাকে ছেড়ে থাকাটা খুব কষ্টের ব্যাপার। ঠাকুমার মুখেই শুনেছিলুম যে, তেরো বছর বয়সে তাঁর মাকে ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। শুনে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "তোমার কষ্ট হইত না?"

পান ছেঁচতে-ছেঁচতে ঠাকুমা বলেছিলেন, "তা আর হইত না? খুব কষ্ট হইত।"

"তয় তুমি দাদুর সঙ্গে বিয়া বসলা ক্যান্?"

প্রশ্ন শুনে ঠাকুমা তো হেসেই অস্থির। হাসেন আর ঠাকুর্দার দিকে তাকিয়ে বলেন, "কীগো, তোমার সঙ্গে বিয়া বসলাম ক্যান্?"

ঠাকুর্দা বললেন, "ওহে অমলাংশুবাবু, তুমি এই বুড়ো বয়সে আমাদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছাড়বে দেখছি। ঠাকুমার কষ্ট নিয়ে তো তোমার মহা দুশ্চিন্তা। আর এদিকে দাদুকে বিয়ে না করলে যে দাদুর ভীষণ কষ্ট হতো, তাতে বুঝি তোমার আপত্তি নেই? ভাগ্যিস তোমার ঠাকুমা আমাকে বিয়ে করেছিলেন, তা নইলে তো আমার বিয়েই হতো না। সেটাও একবার ভেবে দ্যাখো।"

মা আর মেয়ের মধ্যে সেই যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, সত্যিই আর কখনও তাঁদের দেখা হয়নি। লোকেশ্বর কিন্তু তার পরেও একবার খাবাসপুরে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রজিতের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন ঠাকুর্দা তাঁকে মামাবাড়ির দেশ দেখিয়ে আনবার জন্যে খাবাসপুরে নিয়ে যান এবং সেইখানেই তাঁকে রেখে আসতে বাধ্য হন। রামজয়ের স্ত্রীই নাকি তাঁর দৌহিত্রটিকে আর ছাড়তে চাননি। লোকেশ্বরকে তিনি বলেছিলেন, "মাইয়ারে তো জন্মের মত কাইড়া নিছ, অখন এই নাতিডারে লইয়া আর শত্রুতা কইরো না। অরে অন্তত রাইখা যাও। দেখি, অরে আমার কোলে লইয়া যদি চিত্তর কথা ভুইলা থাক্‌পার পারি।"

ইন্দ্রজিৎকে অগত্যা খাবাসপুরেই রেখে আসতে হল। ঠিক হল, এখনকার মত তিনি সেইখানেই থাকবেন। প্রথমে পড়বেন খাবাসপুরের পাঠশালায়। তারপর, আর-একটু বড় হলে, তাঁকে বীরপুরের ইশকুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। বাস্, সেই যে ইন্দ্রজিৎকে মামাবাড়িতে আটকে রাখা হল, পনের বছরের

মধ্যে আর তাঁকে ছাড়া হল না। ছাড়া পাবার জন্যে ইন্দ্রজিৎ যে বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন, তাও নয়। এমন অবাধ স্বাধীনতা তিনি আর কোথায় পাবেন? লেখা-পড়ায় তাঁর দারুণ মাথা ছিল, কিন্তু সাঁতার কাটা, নৌকো বাওয়া আর একগাদা বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের ফলমূলের বাগান সাফ করে দেওয়াতেও উৎসাহ কিছু কম ছিল না। খাবাসপুরের মাঠেঘাটে আর অরণ্য-প্রান্তরে তিনি হই-হই করে ঘুরে বেড়াতেন।

রামজয় মাঝে-মাঝে বলতেন, "নাঃ, তরে এই খাবাসপুরে রাইখ্যা দ্যাখতে আছি ভাল কাম করি নাই। লেখাপড়া করস না, সারাডা দিন খালি দুষ্টামি কইরা বেড়াস। চল্ তরে কইলকাতায় রাইখা আসি।"

কিন্তু রামজয়ের কথায় ইন্দ্রজিৎ মোটেই ভয় পেতেন না। কেননা তিনি খুব ভালই বুঝেছিলেন যে, দিদিমা তাঁর মস্ত সহায়। ইন্দ্রজিৎকে যে কলকাতায় পাঠাবার কথা ভাবা হচ্ছে, ঘুণাক্ষরে এমন আভাস পেলেই দিদিমা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। রামজয়কে বলতেন, "মাইয়াডারে তো খেদাইছ, অখন নাতিডারে কোলে লইয়া যে এট্টু শান্তি পাই, তাও বুঝি তোমার সইঝ্য হয় না? তারেও খেদাইয়া দিবার চাও?"

আমতা-আমতা করে রামজয় বলতেন, "আহা, অত রাগ করো ক্যান? কইল-কাতায় পাঠাইয়া দিবার কথা কি আর সাধে কই? পড়াশুনা তো দেহি এক্কেরেই করে না। শ্যাষে জামাই কইব যে, মামার বাড়িতে থাইক্যা তার ছাওয়াল এক্কেরে গোল্লায় গ্যাছে।"

উত্তরে দিদিমা বলতেন, "পড়াশুনার বয়সই কি অর হইছে নাকি?"

মাত্রাছাড়া আদর আর প্রশ্রয়ের ফল যা হবার তা-ই হল, দিদিমার মতন এত বড় সহায় যখন পাওয়া গেছে, তখন আর ভাবনা কী, সকাল থেকে সন্ধে অব্দি ইন্দ্রজিৎ শুধুই খেলে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর দেখা মিলত শুধু খাওয়া আর ঘুমোবার সময়ে, বাকী সময়টা তিনি নিরুদ্দেশ। দশে পা দেবার আগে যে তাঁকে ইশকুলে পাঠানো যায়নি, তাতে অতএব বিস্ময়ের কিছু নেই।

বীরপুরের ইশকুলে অবশ্য বরাবরই তিনি প্রথম হতেন; মাস্টারমশাইরা বলাবলি করতেন যে, এমন মেধাবী ছাত্র এর আগে আর কখনও তাঁরা পাননি। উপরের ক্লাসে যখন পড়েন, তখন তাঁকে দেখে অবশ্য ছাত্র বলে কারও মনে হতো না। না-হওয়াই স্বাভাবিক। একে তো সহপাঠীদের তুলনায় তাঁর বয়স বেশী; তার উপরে আবার স্বাস্থ্যও ছিল একটু বেশী রকমের ভাল। ফলে বয়সের চাইতেও তাঁকে বড় দেখাত। প্রবেশিকা পরীক্ষার মাস দুয়েক আগে হঠাৎ কল-কাতায় চলে আসেন ইন্দ্রজিৎ। বড় হয়ে সেই তাঁর প্রথম কলকাতায় আসা। তাঁর বয়স তখন কুড়ি, তাঁর নাকের নীচে তখন দিব্যি পুরুষ্টু একখানা গোঁফ গজিয়ে গেছে।

পাঁচ বছর বয়সে বাপের কোলে চড়ে মামাবাড়ি গিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎ। ছেলের সেই পাঁচ বছর বয়সের মুখখানাই এতদিন চিত্তসুন্দরীর মনের মধ্যে আঁকা

ছিল। সেই ছেলে যখন আবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, চিত্তসুন্দরীর মুখে আর তখন কথা সরে না।

কথা অবশ্য ইন্দ্রজিতেরও সরছিল না। জ্বর-গায়ে তিনি সেবারে কলকাতায় এসেছিলেন। মা যখন তাঁর কপালে হাত রাখেন, তখন মনে হয়েছিল, জীবনে এত ঠান্ডা ছোঁয়া আর কখনও তিনি পাননি। অন্যদিকে, অস্বস্তিও নেহাত কম হচ্ছিল না। চারদিকে তাকিয়ে খালি-খালি মনে হচ্ছিল, এ তাঁর নিজের বাড়ি নয়, ভুল করে অন্য কারও বাড়িতে এসে উঠেছেন।

ইন্দ্রজিৎকে দোষ দেবার উপায় নেই। এটাই যে তাঁর নিজের বাড়ি, এ'রাই যে তাঁর আত্মজন, তা কি আর তিনি জানতেন না? জানতেন। কিন্তু সেটা নেহাতই বাইরে থেকে জানা। দৈনন্দিন যে ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়ে সেই জানাটা আমাদের অস্তিত্বেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়, সেই ঘনিষ্ঠতা তাঁর ভাগ্যে—অন্তত তখনও পর্যন্ত—ঘটেনি। নিতান্ত শৈশবে তাঁর বাপ-মাকে ছেড়ে তিনি দূরে চলে গিয়েছিলেন; তার পর, এক-আধ বছর নয়, পুরো পনর বছর এই বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তাঁর ছিল না।

তাঁর দিদি প্রভাবতীর যখন বিবাহ হয়, ইন্দ্রজিৎ তখন খাবাসপুরে। দিদির মৃত্যু-সংবাদও সেই খাবাসপুরে থাকতেই তিনি পেয়েছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরও চারটি ভাইবোন তাঁর হয়েছে। বিভাবতী, বিদ্যাবতী, চন্দ্রজিৎ আর রণজিৎ। তাদের একজনকেও এর আগে তিনি দেখেননি। ছোট-ছোট ভাইবোনেরা একে-একে এসে প্রণাম করছিল, আর ইন্দ্রজিৎ শুধু অবাক হয়ে তাদের দেখে যাচ্ছিলেন। চিত্তসুন্দরী বলছিলেন, "এই বিদ্যা, এই চন্দ্র, আর এই হইল রনো।"

বিভাবতীর ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিপত্নীক জ্যেষ্ঠ জামাতার হাতে তাকে সমর্পণ করেছিলেন লোকেশ্বর। কুণ্ঠিত পায়ে সেও এক সময় তার দাদার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে বছর সাত-আটের ছোট্ট একটি ছেলে। প্রভাবতীর ছেলে।

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কে মা?"

বোন আর মা-মরা ভাগ্নের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের পরিচয় করিয়ে দিলেন চিত্তসুন্দরী; প্রভাবতীর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বিভাবতীকে বললেন, "দাদারে পেন্নাম কর।" তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে: "দাদারে কখনও দেখে নাই তো, তাই লজ্জায় এতক্ষণ সামনে আইতে পারতেছিল না।"

ইন্দ্রজিতের ভারী অদ্ভুত লাগছিল। এরাই আমার আপনজন। আমার ভাই, আমার ভাগ্নে, আমার বোন। অথচ এদের একজনকেও আমি কখনও দেখিনি। বা রে!

চিত্তসুন্দরী বললেন, "ইন্দ্র, সেই কোন্ পাঁচ বছর বয়সে তরে দেখছি, প্রথমে কিন্তু আমিও তরে চিনতে পারি নাই।"

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ। বললেন, "আমিও কিচ্ছুই চিনতে পারতেছি না।"

তার মাস কয়েক বাদেই ইন্দ্রজিতের বিয়ে দিলেন লোকেশ্বর। পদ্মাপারের দেশের থেকে বউ নিয়ে এলেন। সুশ্রী চেহারার ছোট্ট বউ। পিঠের উপরে এক ঢাল চুল। চোখ দুটি টানা-টানা। নাকটিও টিকোলো। শহরের মেয়ে হলে বলা যেত, তখনও তাঁর পুতুল খেলার বয়েস যায়নি। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো, তার উপরে মা-মরা মেয়ে, তাই তখনই তিনি উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, হাত-পা না পুড়িয়ে, ফ্যান গালতে শিখেছেন। বউয়ের নাম সুহাসিনী। লোকেশ্বর বলতেন, "সার্থক নাম। বউমার মুখখানিতে সব সময়ে হাসি লেগে রয়েছে।" হাসিটা, বলা বাহুল্য, চিত্তসুন্দরীরও ভাল লেগেছিল। কিন্তু তবু যে তিনি ষোলআনা খুশী হতে পারেননি, তার কারণ, সুহাসিনীর রঙ ময়লা।

সুহাসিনী আমার মায়ের নাম। তিনি যখন বউ হয়ে এ-বাড়িতে আসেন, তখন তাঁর বয়েস মাত্র দশ বছর। আমার সেজোপিসী বিদ্যাবতীরও তখন ওই একই বয়েস। বড়-কাকার বয়েস পাঁচ-ছয় আর মেজো-কাকার বয়েস তিন।

"রনোর মুখে তখন কথাই ভাল কইরা ফোটে নাই," দেশের বাড়ির মেয়ে-মজলিসে বসে মা একদিন বলছিলেন, "আর চন্দর তো তখন সারাডা দিন উদাম হইয়া ঘুইরা বেড়ায়। আমি তখন বউ মানুষ, বাবা আমারে সাবধান কইরা দিছিলেন যে, বেশী কথা কইলে নিন্দা হইতে পারে, তাই কইলকাতায় আসার পরের দিন তো ঘরের মইধ্যে ঘোমটা দিয়া চুপ কইরা বইসা আছি, এমন সময় মা আইসা চন্দর আর রনোরে আমার কোলের মইধ্যে বসাইয়া দিয়া কইলেন, বউমা, তোমার আর কিচ্ছু করনের দরকার নাই, রান্ধন-বাড়নের কাম যা আছে তা আমিই করবার পারব, তুমি শুধু এই বান্দর দুইডারে এট্টু সামলাইয়া রাখো। তা মা যে 'বান্দর' কইছিলেন, খুব মিথ্যা কন নাই। মাঝে-মইধ্যে ইচ্ছা হইত যে, বিদ্যার সঙ্গে এট্টু পলাপলি খেলি, তা চন্দর আর রনোর জইন্যে তো আর খেলাধুলার ফাঁকই পাইতাম না। উঃ, এই বান্দর দুইডা তখন আমারে সারাডা দিন যা জ্বালান্ জ্বালাইছে, তত জ্বালান্ আমার নিজেরগুলাও আমারে জ্বালায় নাই।"

আমার মাতামহের নাম গঙ্গাধর চক্রবর্তী। তিনি পদ্মাপারের মানুষ। কিন্তু কর্মসূত্রে তাঁকে কোচবিহারে থাকতে হতো। বড়মামা আর মা তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান। তাঁরা থাকতেন দেশের বাড়িতে। দিদিমা যখন মারা যান, বড়মামার বয়েস তখন সাত বছর, আর আমার মায়ের বয়স তখন নেহাতই কয়েক মাস। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দাদামশাই তখন দেশের বাড়িতে চলে আসেন। সেখানে এসে তিনি আবার বিয়ে করলেন। সেই নতুন-দিদিমাকে আমি দেখেছি। আমার মায়ের নাম তো সুহাসিনী, সেই নামটাকে ছোট করে নিয়ে তিনি তাঁকে 'হাসি' বলে ডাকতেন।

নতুন-দিদিমা যে আমার মায়ের আপন মা নন, সৎ-মা, তা আমি জানতুম না। মা বলেন, "আমিই কি জানতাম?" কিন্তু এসব কথা বেশী দিন অজানা থাকে না, পাড়াপ্রতিবেশীরাই গায়ে পড়ে জানিয়ে দেয়। মায়ের কাছে শুনেছি, কথাটা জানবার পরে তিনি হাপুস-নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিলেন। "মা আমারে যতবার কয়, 'ও হাসি, তুই কান্দিস ক্যান', আমি কিছু কইতে পারি না, তত আমি কাইন্দা ভাসাই। শ্যাষে অনেক কষ্টে নিজেরে এট্টু সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি, 'মা, আমার নাকি মা নাই?' শুইন্যা মা আমারে কয়, 'এই কথা তরে কেডা কইছে?' আমি কইলাম, 'মিত্তির-বাড়ির বড়পিসি কইছে।' কইতে-কইতে দেখি মা-ও কাইন্দা ফেলাইছে। কানতে-কানতেই মা আমারে কইল, 'মিত্তির-বাড়ির ঠাকুরঝির তো আর খাইয়া-দাইয়া কাম নাই, যা, তারে গিয়া জিগাইয়া আয় যে, তর যদি মা নাই তো এক বছর বয়সের থিকা তরে মানুষ করছে কেডা?"

দাদামশায়কে আমি একবার মাত্র দেখেছিলুম। আমার বয়েস তখন চার বছরও হয়নি। ওই বয়সের কথা অনেকের মনে থাকে না। আমার আছে। আবছা-আবছা মনে পড়ে যে, তাঁর খুব লম্বা দাড়ি ছিল। সেই দাড়ির প্রান্ত তিনি তাঁর কোটের পকেটে গুঁজে রাখতেন। আমাকে তিনি 'দাদাভাই' বলতেন, আর বাবাকে বলতেন, 'বাবাজীবন'।

॥ ৫ ॥

জাগীর-দাদাকে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর্দা। তাকে বললেন, "জাগীর, একটা কাজ করতে হবে। উত্তরের বাড়ির বিশ্বম্ভর আর মধ্যের বাড়ির যতীন্দ্রকে একবার ডেকে নিয়ে আয়। আমার নাম করে বলবি যে, খুব জরুরী দরকার, এক্ষুনি যেন চলে আসে। আর হ্যাঁ, দেখিস যেন ছেলেপুলেদের ঘুম না ভেঙে যায়। চেঁচামেচি করবি না, শুধু বিশ্বম্ভর আর যতীন্দ্রকে ঘুমের থেকে তুলে আনবি।"

যমুনা-দিদি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ঠাকুমা আর বড়-কাকীমা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। এত রাত্রে সে এখানে কী করে এল, কেন এল, জাগীর-দাদা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। ঠাকুর্দাকে সে একবার জিজ্ঞেস করল, "বেপার কী, কার্তা? কিসিকো বেমার-উমার হইসে?"

ঠাকুর্দা বললেন, "পরে শুনবি। এখন আর দেরি করিস না, বেরিয়ে পড়।"

উত্তরের বাড়ির বড়-জ্যাঠামশাই আর মধ্যের বাড়ির রাঙা-জ্যাঠামশাই তার খানিক বাদেই জাগীর-দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তাঁদের তুলে আনা হয়েছে, দুজনকেই তাই খুব বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

রাঙা-জ্যাঠামশাই একবার যমুনা-দিদির দিকে তাকালেন। তারপর ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কী, খুড়ামশাই? মহাদেব ফিরা আইছে?"

"তা ফিরেছে।"

"ভাল আছে তো?"

চিবুকে আঙুল ঘষতে ঘষতে ঠাকুর্দা বললেন, "আছে বলেই তো মনে হয়, নইলে কি আর এই অবস্থায় এমন কাণ্ড করে?"

তারপর একটু থেমে বললেন, "যতীন্দ্র, মহাদেবের চালচলন দেখে তোমরা তাকে একবার একঘরে করবার কথা ভেবেছিলে। তখন আমিই তোমাদের বাধা দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, ওকে ভাল হবার সুযোগ দাও, হয়তো শুধরে যাবে। তা এখন দেখছি, তোমাদের বাধা দিয়ে আমি ভুল করেছিলুম। মহাদেব একটি পাষণ্ড। যমুনা ওকে প্রাণপাত পরিশ্রম করে সুস্থ করে তুলল। এখন তার প্রতিদানে ও কী করেছে ভাবতে পারো?"

জাগীর-দাদার লণ্ঠনের কাঁচ ভাঙা। বাতাসের ঝাপটায় যাতে না আলো নিবে যায়, ভাঙা জায়গাটায় তার জন্যে একটা পুরনো পোস্টকার্ড গুঁজে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাতাস তাতে পুরোপুরি আটকায়নি। আলোর শিখা তাই কাঁপছিল। বেড়ার উপরে যে ছায়া পড়েছে, সেই ছায়াটাও নিমেষে-নিমেষে

পালটে যাচ্ছিল। লণ্ঠনের থেকে ধোঁয়াও উঠছিল খুব। সরু, কালো একটা ধোঁয়ার সুতো খানিকটা উপরে উঠেই হাওয়ার ধাক্কায় ভেঙে যাচ্ছিল। ঠাকুমার কাছে শুনেছি, সলতেটাকে গোল করে না-কাটলে এই রকমের 'শিষ' ওঠে। জাগীর-দাদা বোধ হয় তার লণ্ঠনের সলতেটাকে কখনও ঠিক করে কাটে না।

চুপ করে বসে আছে সবাই। এই অবস্থায় ঠিক কী যে বলা যায়, তা বোধহয় কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু মাঝে মাঝে এক-একবার ফুঁপিয়ে উঠছে যমুনা-দিদি। ঠাকুর্দা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যতীন্দ্র, আমরা ভেবেছিলুম, বউয়ের উপরে রাগ করে মহাদেব বুঝি তার কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেছে, রাগ পড়লেই ফিরবে। কিন্তু এখন দেখছি, তা নয়, মহাদেব আসলে বিয়ে করতে গিয়েছিল। একটু আগে বউ নিয়ে ফিরেছে। আবার কার সর্বনাশ করল, কে জানে।"

রাঙা-জ্যাঠামশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বড়-জ্যাঠামশাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "খুড়ামশাই, তাইলে সইত্য কথাই কই, এই রকমেরই কিছু-এট্টা কাণ্ড হইতে পারে, তা কিন্তু আমি অনুমান করছিলাম। এহোনই ওই হারামজাদারে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া এই গেরামের থিক্যা বাইর কইরা দ্যাওয়া উচিত।"

ঠাকুর্দাকে আমি কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতে দেখিনি। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। যেমন বলছিলেন, তেমনি শান্তভাবেই বললেন, "বিশ্বম্ভর, তুমি ঠিকই বলেছ। ঘাড়ে-ধাক্কার বদলে যদি ওর ঘাড়টাকে ভেঙে দেবার কথা বলতে, তা হলেও কিছু অন্যায় হতো না। কিন্তু যমুনার দুঃখ তাতে ঘুচবে না। মহাদেবকে তোমরা শাস্তি দেবার কথা ভাবছ তো? ওটা একটু পরে ভাবলেও ক্ষতি নেই। এখন চলো, ব্যাপারটা একবার দেখে আসি।"

যমুনা-দিদি তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হল না। ডুকরে কেঁদে উঠে রাঙা-জ্যাঠামশাইকে বলল, "আমারে আর ওই বাড়িতে যাইতে কইও না, রাঙ্গাকাকা, ওইখানে আর আমার আছে কী?"

ঠাকুমা বললেন, "আমারও গিয়া কাম নাই।"

বড়-কাকীমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে যমুনা-দিদির পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, এবারে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চাপা-গলায় আমাকে বললেন, "অমু, তুইও যাইস না।"

আমি সে কথায় কান দিলুম না। আমার মনে হচ্ছিল, একটা-কিছু কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, খুব সম্ভব মহাদেবদাকে এখন সবাই মিলে খুব ঠ্যাঙানো হবে, আমি তো ওই পাজি লোকটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারি না, আমার সামনেই যমুনা-দিদিকে ও একদিন একটা গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল, তা ছাড়া "উঃ, এই পোলা-পানগুলার জ্বালায় উঠানডা এক্কেরে আদাড় হইয়া গেল" বলে চোখ পাকিয়ে তেড়ে এসে আমাদের বাতাবি-লেবুর ফুটবলটাকেও কেড়ে নিয়েছিল একদিন সেই থেকে আমি ওর উপরে ভীষণ রেগে আছি, মেঘুকে বলেছি—গুলতি দিয়ে

দাঁড়কাকটাকে মারবার পরে ওকেও আমি মারব, কিন্তু এখন দেখছি, তার আর দরকার হবে না, তার আগে এরাই এখন দল বেঁধে তাকে ঠ্যাঙাতে চলেছে, ঠাকুর্দা যতই আটকাবার চেষ্টা করুক, জাগীর-দাদা আর বড়-জ্যাঠামশাই নিশ্চয় মহাদেবদাকে আজ বেদম মারবে। এখন কিনা বড়-কাকীমা বলছেন, "অমু, তুইও যাইস না।" আমার গুলতিটা ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বেড়ার চটায় সেটাকে গুঁজে রেখেছিলুম। চটপট সেটা নামিয়ে নিয়ে, ঠাকুর্দার হাতখানা খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আমি বললুম, "দাদু, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

একটুক্ষণ চিন্তা করে ঠাকুর্দা বললেন, "চল।"

ঘর থেকে আমরা উঠোনে নামলুম। রাত্তির হলেই আমাদের উঠোনের কামিনী-গাছটার চেহারা কেমন যেন পালটে যায়। রাত্তিরের খাওয়া চুকে যাবার পরে বারান্দায় এসে যখন মুখ ধুই, তখন রোজ একবার ওই গাছটাকে দেখি। তখন মনে হয় ঝাঁকড়া-চুলো একটা মানুষ যেন কম্বল গায়ে দিয়ে আমাদের উঠোনের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে মুখ ধোয়া হয় না, তাড়াতাড়ি একবার কুলকুচো করেই বারান্দা থেকে এক দৌড়ে ঘরে এসে ঠাকুর্দার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। আজ কিন্তু কামিনী-গাছটাকে গাছ বলেই মনে হল। ঠাকুর্দা রয়েছেন, বড়-জ্যাঠামশাই আর রাঙা-জ্যাঠামশাই রয়েছেন, জাগীর-দাদাও রয়েছে —আজ আর তাই একটুও ভয় পেলুম না। এক হাতে ভাঙা লণ্ঠন, অন্য হাতে পাকা বাঁশের মস্ত একটা লাঠি, জাগীর-দাদা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

যমুনা-দিদিকে আমি কখনও ঘোমটা দিতে দেখিনি। বড়-কাকীমা কিন্তু সব সময়ে ঘোমটা দেন। তাঁকে এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলুম। তাতে তিনি বললেন, "আমি বউ-মানুষ, ঘোমটা না দিয়া আমার উপায় আছে নাকি, নিন্দা হইব না?"

"যমুনা-দিদিও তো বউ-মানুষ। তয় সে ঘোমটা দ্যায় না ক্যান?"

শুনে বড়-কাকীমা হেসে বলেছিলেন, "বাঃ রে, তার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয় নাকি? তোর যমুনা-দিদি তো আর বিয়া হইয়া এইখানে আসে নাই, সে হইল এই গেরামের মাইয়া। এইখানে তার ভাসুর নাই, শ্বশুর নাই, সক্কলের সঙ্গেই তার খুড়া-জ্যাঠার সম্পর্ক।"

মহাদেবদা কিন্তু এই মন্দারগ্রামের মানুষ নয়। যমুনা-দিদিকে বিয়ে করবার পর থেকে সে নাকি এইখানে আছে। ঠাকুমা বলেন, "ঘরজামাই হইয়া আছে। জটাধারী মল্লিকের তো ছাওয়াল ছিল না। মাইয়াও ওই এট্টা। তাই মাইয়ারে আর কাছছাড়া করে নাই।"

মল্লিক-বাড়ির জ্যাঠামশাইকে আমি দেখিনি। শুনেছি, ঠাকুর্দা যে-বছর মন্দারগ্রামে এসে বাড়ি তুলেছিলেন, তার পরের বছরের গোড়ার দিকে তিনি মারা যান। যমুনা-দিদির বয়েস তখন নাকি বারো-তেরোর বেশী নয়। তার তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে।

"মা তো আগেই মরছিল, বাপ্‌ও গেল গিয়া," ঠাকুমা একদিন কাকীমা-

জ্যাঠাইমাদের মজলিসে বসে কাঁথায় ফোঁড় তুলতে তুলতে বলছিলেন, "ওদিকে জামাইডাও_তো নেহাইতই এট্টা অমানুষ, তার কান্ড তোমরা দ্যাখতেই আছ, পুলিসে কাম পাইছিল, ঘুষ খাইয়া সেডা খোয়াইয়া তারপর যাত্রার দলে কর্নেট বাজায়, ভাবগতিকও কোনও কালেই সুবিধার না, এক রাইত যদি বাড়িতে থাকে তো পরের রাইতে তার আর খোঁজ নাই, তারপর কোথার থিকা যে যক্ষ্মা বাধাইয়া বসল, কেডা জানে, মাইয়াডারে এক্কেরে ভাজা-ভাজা কইরা মারতে আছে।" তারপর একটু থেমে বললেন, "পোলাপান হয় নাই, যমুনার তার জইন্যে মহা দুঃখ, কিন্তু অখন তো মনে হয়, পোলাপান না-হইয়া একদিক থিকা ভালই হইছে। ছোঁয়াইচা রোগ, পোলাপানের বাড়ি হইলে আর রইক্ষ্যা ছিল না।"'

মহাদেবদার যক্ষ্মা হওয়ায় মল্লিক-বাড়িতে আর যাবার উপায় ছিল না। মধ্যের বাড়ির রাঙা-জ্যাঠামশাই আমাকে আর মেঘুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, খবর্দার, আর যেন ওই বাড়িতে আমরা না যাই। ফলে আমরা খুব মুশকিলে পড়েছিলুম। একে তো যমুনা-দিদির মতন আমসত্ত্ব আর কুলের আচার কেউ করতে পারে না, তার উপরে আবার মল্লিক-বাড়িতে একটা রোয়াইল গাছ আছে, দূর থেকে সেই রোয়াইল দেখতে পাচ্ছি, অথচ কাছে গিয়ে খাবার উপায় নেই, উঃ, তখন আমাদের কী কষ্টই না গেছে। বাড়িতে ঢুকতুম না, কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করতুম, দেখতে পেতুম যে, বারান্দায় বসে যমুনা-দিদি মাখন টানছে, ডাক্তার-পিসেমশায় নাকি মহাদেবদাকে খুব করে ঘি, মাখন আর ছানা খাওয়াতে বলেছে, কে জানে সেই সব খেয়েই বোধ হয় মহাদেবদার স্বাস্থ্য আবার ফিরে গেল। এর আগে তো ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছিল, খালি বুকে হাত দিয়ে খকর-খকর করে কাসত, তারপর অনেক দিন তাকে দেখিনি, একদিন হঠাৎ দেখি ছড়ি হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে পালানে এসে দাঁড়িয়েছে। আগের চাইতে অনেক মোটা হয়েছে দেখলুম, গাল দুটো লাল টকটক করছে, আমাদের দেখে ভারিক্কে চালে বলল, "কী রে, সক্কাল বেলাতেই ছাড়া-গরুর মতন ঘুইরা বেড়াইতে আছস, তোগো বুঝি ল্যাখাপাড়ার বালাই নাই?"

যমুনা-দিদি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, নাকের ডগায় অল্প-অল্প সিঁদুরের গুঁড়ো লেগে আছে, খুব সম্ভব কপাল থেকে ঝরে পড়েছে, ঠাকুমা সেদিন বড়-কাকীমাকে বলছিলেন যে, নাকের ডগায় সিঁদুরের গুঁড়ো লেগে থাকাটা খুব সৌভাগ্যের লক্ষণ, ওটা মুছতে নেই, খুব সম্ভব যমুনা-দিদিও সে-কথা জানে, তাই আর ওই গুঁড়োগুলোকে মোছেনি। অনেক দিন তাকে কাছের থেকে দেখিনি। দূর থেকে দেখতুম যমুনা-দিদি একমনে কাজ করছে, মুখে একটুও হাসি নেই; তখন তাকে খুব দুঃখী মনে হতো। আজ কিন্তু যমুনা-দিদিকে খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। ডান হাতে ওষুধের খল, সেই খলটাকে মহাদেবদার হাতে তুলে দিয়ে, হাসতে হাসতে বলল, "আহা, ভগ্নীপতির খোঁজ লইতে আইছে, কোথায় এট্টু আদর কইরা কাছে বসাইয়া দুইডা মিঠা কথা কইবা, ঠাট্টা-তামশা করবা, তা না, এক্কেরে পাঠশালার

পণ্ডিতমশাইর মতো গাইলাইতে লইছ।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, তোগো তো আর দেখাই পাওয়া যায় না, আগে তো সারাডা দিন যমুনা-দিদির কাছেই পইড়া থাকতি, অখন আর আসিস না ক্যান্?"

আমরা কোন কথা বললুম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন যমুনা-দিদি আবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দুটো চিঁড়ের মোয়া নিয়ে এসে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "তোগো জামাইবাবুর অসুখ সাইরা গেছে। আগে যেমন আসতি, তেমন আবার আসিস, কেমন?"

ফিরে আসতে আসতে মেঘু বলল, "যমুনা-দিদি খুব ভাল। কাউরে কখন খারাপ কথা কয় না, গাইল-মন্দ করে না, রাগ করে না।"

সত্যিই কখনও যমুনা-দিদিকে আমি রাগতে দেখিনি। শুধু একদিন ছাড়া। সেদিন কিন্তু ভীষণ রেগে গিয়েছিল। রেগে গিয়ে আমাকে খুব গালমন্দ করেছিল। 'পাজী' বলেছিল। কিন্তু কেন যে রেগে গিয়েছিল, তা আমি জানি না।

বীরপুরের গঞ্জ থেকে ঠাকুর্দা আমাকে একটা তিন-নম্বরী ফুটবল আনিয়ে দিয়েছিলেন। খেজুরের কাঁটা বিঁধে তার ব্লাডারটা ফুটো হয়ে যায়। মেঘু বলল, মানিক-দাদার একটা বিলিতী আঠা আছে, সেই আঠা দিয়ে সে ফুটো ব্লাডার মেরামত করতে পারে, তাই আমি আমার ফুটবলটা নিয়ে ছোট মিত্তির-বাড়ির মানিক-দাদার কাছে গিয়েছিলুম।

মানিক-দাদা দারুণ ফুটবল খেলতে পারে, মাঝে-মধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকেও তাকে ফুটবল খেলার জন্যে 'হায়ার' করে নিয়ে যায়, আমিও তখন তার সংগে যাই, করমচা আর কাগজী-লেবু নিয়ে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে থাকি, 'হাফ টাইমে'র সময় মানিক-দাদা এসে বলে, "লেবু দে।" ভাল করে তখন কথাও বলতে পারে না, বুকটা ধড়াস ধড়াস করে ওঠানামা করে, দারুণ দৌড়য় তো, তাই হাঁফিয়ে যায়। লেবুর-টুকরো মুখে নিয়ে ঘাসের উপরে চিত হয়ে শুয়ে থাকে মানিক-দাদা, আমি তখন গেঞ্জি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে হাওয়া করি। বাবার সংগে তো কলকাতার মাঠে একবার খেলা দেখতে গিয়েছিলুম; তখন দেখেছিলুম, 'হাফ টাইমে'র সময়ে সবাই বরফ খায়। তা আমাদের এখানে তো আর বরফ পাওয়া যায় না, তাই আমরা ঘটি ঘটি জল, লেবু আর করমচা খাই।

ওইয্যা, কোন্ কথার থেকে কোন্ কথায় চলে এসেছি। যমুনা-দিদির রাগের কথা বলছিলুম। তা মেঘুর কথামতো মানিক-দাদার কাছে গিয়ে দেখি, সত্যিই তার একটা বিলিতী আঠা আছে। তাই দিয়ে সে ব্লাডারটাকে সারিয়েও দিল। ছোট্ট এক-টুকরো রবারকে গোল করে কেটে, তাতে আঠা লাগিয়ে, ব্লাডারের ফুটোর উপরে সেই রবারটাকে সেঁটে দিল মানিক-দাদা, তারপর বলল, "যা, ভুইল্যাও আর কোনো দিন খেজুর গাছের কাছাকাছি ফুটবল খেলিস না।"

তারপর যখন চলে আসছি, তখন পিছন থেকে ডেকে বলল, "অমু, এট্টা কাম করতে পারবি?"

বললুম, "কী কাম?"

"যমুনা তো তরে খুব ভালবাসে। তারে গিয়া এই কাগজখান দিতে পারবি?"

সেই কাগজখানা নিয়েই গণ্ডগোল বাধল। মানিক-দাদা যে মাথামুণ্ডু কী লিখেছিল তার মধ্যে, জানি না, খুব সম্ভব যমুনা-দিদিকে খুব গালমন্দ করেছিল, তা নইলে আর যমুনা-দিদি অত রেগে যাবে কেন? কুটি কুটি করে কাগজখানা ছিঁড়ে আমাকে বলল, "মানিক-দাদার শিষ্য হইছ? পাজী ছাওয়াল, এই জইন্যে তোমারে এত নাড়ু আর মোয়া খাওয়াই? এই জইন্যে রোজ রোজ তোমারে আমসইত্য খাইতে ডাকি? আর একদিনও যদি ওই মানিক-দাদার কাছে গেছ, তয় এই বাড়িতেই তোমার আসা বন্ধ।"

ওই একদিনই আমি যমুনা-দিদিকে রেগে উঠতে দেখেছিলুম।

তার পরের দিনই অবশ্য যমুনা-দিদি আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। পুকুরের ঘাটলায় বসে বঁড়শিতে ভাত গেঁথে আমি আর মেঘু পুঁটিমাছ ধরছি, এমন সময় আমাদের ফাতনার পাশে জলের উপরে হঠাৎ একটা ঢিল পড়তে আমরা চমকে উঠলুম। "এইয়ো, কেডা আমাগো মাছ তাড়াও" বলে পিছন ফিরে দেখি, বিশ্বাস-বাড়ির নকুল। আমরা অবশ্য ওকে 'নকুল' বলি না, নেউল বলে ডাকি, ওর বাবা আমাদের জমি চাষ করে, তা ছাড়া মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে রান্নার জন্যে কাঠ কেটে দিয়ে যায়, সেই কাঠকে আমরা বলি 'চলা', তা বিশ্বাস-বাড়ির ভরত-কাকা তো গত পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে কুড়ুল কাঁধে নিয়ে চলা ফাঁড়তে আসেনি, তাই ঠাকুর্দা আমাকে বলেছিলেন যে, নেউলকে দেখলে যেন তার বাবার কথা একবার জিজ্ঞেস করি; এখন নেউল আমাদের পুকুর-পাড়ে পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছে দেখে ঠাকুর্দার কথা আমার মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করলুম, "তোর বাবা কোথায় রে?"

নেউল বলল, "রহমতপুরে পিসির বাড়িতে বেড়াইতে গেছে, সেইহান থিক্যা হিজলকান্দায় আমার শ্বশুরবাড়িতে যাওনের কথা, সেইহান থিক্যা কাইল বউ লইয়া ফেরবে।"

বউ মানে নেউলের বউ। নেউল আমাদের বন্ধু, কিন্তু এর মধ্যেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে, ওদের নাকি এই রকমের ছেলেবেলাতেই বিয়ে হয়ে যায়, ওর বয়েস তো এখন বছর-সাতেকের বেশী হবে না, ওর বউ সত্যবালার বয়স পাঁচ বছর, হিজলকান্দা আমাদের পাশের গ্রাম, সেখান থেকে সত্যবালাকে এই সেদিনই তো ভরত-কাকার কাঁধে চড়ে আসতে দেখলুম, তা এর মধ্যে আবার বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাকি?

নেউলকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে সে খুব গম্ভীরভাবে বলল, "পেরায়ই তো যায়। এইহানে থাকতেই চায় না। সারাডা দিন খালি কান্দে।"

মেঘু বলল, "তা তার যেইহানে খুশি সেইহানে থাউক, যত খুশি কান্দুক, তুই পোড়াকপাইলা এইভাবে ইটা ফিক্যা আমাগো মাছ তাড়াস ক্যান?"

নেউল সে-কথায় কান দিল না। পেয়ারাতলা থেকে এগিয়ে এসে, যেন খুব গোপন একটা খবর দিচ্ছে, এইভাবে ফিসফিস করে বলল, "যমুনা-দিদি তোগো জইন্যে নাইরকোলের লাড়ু বানাইয়া থুইছে। আমারে দিয়া কইয়া পাঠাইল, এক্তিবেলা গিয়া খাইয়া আয়।"

নাড়ু অবশ্য আর খাওয়া হল না। গোলমাল শুনে দূর থেকেই আঁচ করেছিলুম, এখন মল্লিক-বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি, যমুনা-দিদির সঙ্গে মহাদেবদার তুমুল ঝগড়া হচ্ছে। এইসব সময়ে মহাদেবদার একদম জ্ঞান থাকে না, যাচ্ছেতাই সব গালমন্দ দেয়, হাতের সামনে যা পায় তা-ই ছুঁড়ে মারে। দাওয়ার উপরে কাঁসার গেলাস ছিল একটা, হঠাৎ সেটাকে তুলে নিয়ে সে যমুনা-দিদির দিকে ছুঁড়ে মারল। ভাগ্যিস একটু সরে দাঁড়িয়েছিল যমুনা-দিদি, তাই খুব অল্পের জন্যে সেটা ফসকে গেল, নইলে নিশ্চয় একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। মহাদেবদা তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে। চেঁচাতে চেঁচাতেই উঠোনের থেকে এক লাফে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, তারপর কর্নেটটাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "ঘরজামাই হইয়া মাটি খাইছি। থাক তুই তর ঘর-সংসার লইয়া, আমি চললাম।"

তার দিন কয়েক বাদেই কিন্তু ভীষণ অসুস্থ হয়ে মহাদেবদা আবার মন্দারগ্রামে ফিরে এল। ঠাকুমার মুখে শুনলুম, মহাদেবদার যক্ষ্মা হয়েছে।

সবাই বলত, মহাদেবদা বাঁচবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঠিক বেঁচে উঠল। তখন সবাই বলল, যমুনা-দিদিই ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

কিন্তু বাঁচিয়ে তুলে লাভ কী হল যমুনা-দিদির? সে তো এখন আমাদের ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে।

জাগীর-দাদার লণ্ঠনের আলোয় পথ চিনে চিনে হাঁটতে হাঁটতে যতই আমি যমুনা-দিদির কথা ভাবছিলুম, ততই আরও রেগে যাচ্ছিলুম মহাদেবদার উপরে। মনে হচ্ছিল, বড়-জ্যাঠামশাই আর জাগীর-দাদা মিলে যদি মহাদেবদাকে আজ আচ্ছা করে মারে তো খুব ভাল হয়।

মল্লিক-বাড়িতে পৌঁছে দেখি, বিস্তর লোক সেখানে জড় হয়েছে। আমি ভেবেছিলুম, মহাদেবদা যে আবার বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরেছে, এই খবর বুঝি শুধু আমরাই জানি। কিন্তু এখন দেখলুম, তা নয়। এ-পাড়ার লোকজন তো আছেই, দত্ত-পাড়ারও পাঁচ-ছ জন এসে হাজির হয়েছে। এমন কী, ভুবন-দাদু তো চোখে দেখতে পান না, তা খানিক বাদে তিনিও দেখি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মল্লিক-বাড়িতে এসে ঢুকলেন। এসেই বললেন, "কই মহাদেব, বউ দ্যাখাও।"

অন্ধ মানুষ, বউ 'দেখতে' চাইছেন, শুনে তো আমার বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠল। এমনিতেই ওঁর অন্ধ হবার কারণ শুনবার পর থেকে ভুবন-দাদুকে দেখলেই আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করে, তার উপরে আবার একা একা যে

কীভাবে উনি নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় চলে যান, বুঝতে পারি না। সবচাইতে ভয় হয়, উনি যখন 'দেখা'র কথা বলেন। দিন কয়েক আগে একবার দত্ত-পাড়ায় গিয়েছিলুম, ভুবন-দাদু সেই খবর পেয়ে বলেছিলেন, "ইন্দ্রজিতের পোলা আইছে বুঝি, একবার কাছে লইয়া আয় তো," তারপর আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার চিবুক ধরে বললেন, "দেখি, দেখি, মুখখান একবাব দেখি।" সেদিন আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম। আজ আবার সেই অন্ধ মানুষটি বউ দেখতে চাইছেন।

একদিকে যেমন ভুবন-দাদুর কথা শুনে অস্বস্তি হচ্ছিল, অন্য দিকে তেমনি আবার মহাদেবদাকে মারধোর করবার কোনও উদ্যোগই আমার চোখে পড়ছিল না। কোথায় এখন ওই দুষ্টু লোকটাকে ঠ্যাঙানো হবে, তা নয়, দিব্যি সবাই পান চিবুচ্ছে আর হ্যা-হ্যা করছে।

উঠোনের মাঝখানে একটা খুঁটি পুঁতে সেই খুঁটির মাথায় একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বারান্দার একদিকে একটা তোরঙ্গের উপরে ঘোমটা টেনে বসে আছে নতুন বউ। অন্যদিকে একটা মস্ত সতরঞ্চি। সেই সতরঞ্চির উপরে বসে আছে গ্রামের লোকেরা। তাদের মধ্যে সিকদার-বাড়ির ফটিক-কাকাকেও দেখলুম। ফটিক-কাকা তামুক খাচ্ছিল। আমরা যেতেই হুঁকোটা লুকিয়ে ফেলে ঠাকুর্দার সামনে এসে বলল, "খাসা বউ হইছে মহাদেবের।"

মহাদেবদা বলল, "বসেন ঠাউরদাদা।"

ঠাকুর্দা বসলেন না। খুব বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "বউ তো তোমার ছিলই মহাদেব, তাহলে আবার হঠাৎ তুমি বিয়ে করতে গেলে কেন?"

শুনে মহাদেবদা বলল, "বে-আইনী কোনও কাম তো করি নাই। যমুনার তো আর পোলাপান হওনের আশা নাই, তাই বাইধ্য হইয়াই আবার আমারে বিয়া করতে হইল। আপনারাই কন, আমি কি কোনও পাপ-কাম করছি?"

ঠাকুর্দা বললেন, "না, না, পাপ করবে কেন, মস্ত বড় পুণ্যের কাজ করেছ। শুধু মনে রেখো যে, বাড়িটা তোমার নয়, যমুনার। যমুনাকে আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার কপালের ভোগ খণ্ডাতে পারি, এমন সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু যদি শুনি যে, তার উপরে কোনও অত্যাচার হয়েছে, তা হলে কিন্তু তোমার বিপদ ঘটবে। এখন যারা তোমার দাওয়ায় বসে পান চিবুচ্ছে আর তামাক টানছে, তখন কিন্তু তাদের কেউই তোমাকে বাঁচাতে আসবে না।"

কেউ কোনও কথা বলল না। ঠাকুর্দা বললেন, "চলো বিশ্বম্ভর, বাড়ি যাই।"

সেই রাত্রেই জাগীর-দাদা আবার যমুনা-দিদিকে মল্লিক-বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে আর যমুনা-দিদিকে মন্দারগ্রামে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিকেল বেলায় নেউল এসে খবর দিল, মানিক-দাদাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

আমার পিতৃদেব শ্রীইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের চেহারা ছিল চোখে পড়বার মতো। তিনি তাঁর মায়ের রূপ ও রঙ পেয়েছিলেন। তাঁর মাতামহী যে তাঁকে কোলে নিয়ে দূরবাসিনী কন্যার কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মাতা ও পুত্রের মুখশ্রীর মধ্যে এতটা মিল সত্যিই বড়-একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিতের চরিত্রও ছিল তাঁর মায়েরই মতো; স্পষ্ট এবং উচ্চারিত। এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা খুবই ঋজু রেখায় টানা। তাঁদের দেখবামাত্র মনে হয় যে, সমস্তটাই দেখা হল; দু-চার মিনিট কথা বললেই বুঝতে পারা যায় যে, ইনি তাঁর সমস্ত তাস দেখিয়ে দিয়েছেন, আস্তিনের তলায় কিছু লুকিয়ে রাখেননি। ইন্দ্রজিৎ ছিলেন সেই রকমের মানুষ। তিনি হিসেব করে পা ফেলতে ভালবাসতেন না; কাউকে সন্দেহ করতে ভালবাসতেন না; বর্তমানের ভাঁড়ার থেকেই যখন প্রভূত আনন্দ ও উন্মাদনা আদায় করে নেওয়া যাচ্ছে, তখন ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসতেন না। "ও যা হবার, হবে"—জীবন সম্পর্কে এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তিনি পড়তে ও পড়াতে ভালবাসতেন; হাসতে ও হাসাতে ভালবাসতেন; খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন।

তাঁর চরিত্রে যে কোনও অসংগতি ছিল না, তা নয়; কিন্তু—খুব সম্ভব একটু অন্য মাপের মানুষ বলেই—সেই সব অসংগতিকেও তাঁর ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হতো। একদিকে তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে ছ' ফুট, এবং শারীরিক শক্তিও ছিল অসামান্য রকমের। অন্য দিকে তাঁর কথাবার্তায় ও চালচলনে সেই নির্মল বিস্ময় ও নিষ্পাপ সারল্য প্রকাশ পেত, যা কিনা বালকদের মধ্যেও সর্বদা চোখে পড়ে না। এমনিতে তিনি খুব আমুদে ও স্ফূর্তিবান মানুষ ছিলেন। উত্তেজনায় সমস্তক্ষণ টগবগ করে ফুটতেন; হাতের ছড়িখানাকে—অন্যের পক্ষে বিপজ্জনকভাবে—ঘোরাতে ঘোরাতে চলাফেরা করতেন; কেউ কোনো কৌতুকের কথা বললে আচমকা এমন বিষম জোরে হেসে উঠতেন যে, আশপাশের লোকেরা সেই হাসির শব্দে চমকে যেত। অন্য দিকে, তাঁর ক্রোধও ছিল প্রলয়ংকর। তিনি যখন রেগে যেতেন, তখন কারও পক্ষেই তাঁর সামনে যাওয়া নিরাপদ ছিল না।

একবারের কথা বলি। আমার বয়স তখন বছর সাতেক। গঙ্গার ঘাট থেকে বাবার সঙ্গে বাসে করে বাড়ি ফিরছিলুম, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ে যে, কনডাকটর এক বৃদ্ধা মহিলাকে প্রায় ধাক্কা মেরে বাসের থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। ফলে

তিনি সেই পানজাবী কনডাকটরটিকে চলন্ত বাসের থেকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে এমন ভয়ংকরভাবে প্রহার করেন যে, শেষ পর্যন্ত তাকে অ্যামবুলেনসে করে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। কিন্তু বাবার রাগ যেহেতু ইতিমধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তাই তাঁকেও তক্ষুনি একটা ট্যাকসি নিয়ে সেই অ্যামবুলেনসের পিছনে পিছনে হাসপাতালে ছুটতে হয়। সেখানে তাঁর কাছে ঘটনার অনুপূর্ব বিবরণ শুনে ইমারজেনসি ওয়ার্ডের ডাক্তারবাবুটি মন্তব্য করেন, "সার্ভড্ হিম রাইট। তবে হ্যাঁ, আপনাকেও বলি, কতটা মারলে একটি লোককে শাস্তি দেওয়া হয়, এবং কতটা মারলে একটা মার্ডার-কেসে জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, ভবিষ্যতে দয়া করে সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন।"

পড়াশুনো এবং খেলাধুলো, দুয়ের প্রতিই ইন্দ্রজিতের আকর্ষণ ছিল সমান। অধিকাংশ লোকই অবশ্য তাঁর এই দ্বিমুখী আকর্ষণের খবর রাখতেন; কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না, যাঁদের একাংশ তাঁকে শুধুই একজন সফল অধ্যাপক হিসেবে চিনতেন, এবং অন্যাংশ চিনতেন শুধুই একজন কৃতী খেলোয়াড় হিসেবে। শুনেছি, সবে যখন চাকরি নিয়ে কলেজে ঢুকেছেন, তখন রুটিন করবার ব্যাপারে তাঁর সহকর্মীদের খুব সতর্ক থাকতে হতো; দিনের শেষের দিকে ক্লাস দিয়ে তাঁকে আটকে রাখবার উপায় ছিল না। অনার্সের ছেলেদের শেক্সপীয়র পড়িয়ে, কলেজ থেকে তিনি সোজা ময়দানে চলে যেতেন, এবং চটপট পোশাক পালটে, কলকাতার এক অতি-বিখ্যাত ক্লাবের জার্সি পরে মাঠে নামতেন। উনিশ শো ষোলো থেকে উনিশ শো বাইশ সালের মধ্যে যাঁরা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখেছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত সেই অতিদীর্ঘ ফুল-ব্যাকটিকে স্মরণ করতে পারবেন, বিভিন্ন রেজিমেনটের গোরা-খেলোয়াড়-রাও যাঁকে অন্যায়ভাবে 'ট্যাকল' করতে সহসা সাহসী হতো না, এবং যাঁকে ফাঁকি দিয়ে গোলের দিকে ধাবিত হওয়া নাকি অতি-দুরূহ ব্যাপার বলে গণ্য হতো।

গল্প শুনেছি, ইন্দ্রজিতের এক প্রবীণ সহকর্মী তাঁর এই দ্বিতীয় ভূমিকার খবর শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কলেজের অধ্যাপক হাফপ্যান্ট পরে মাঠে নামেন, এবং—কে জানে—ওই হ্রস্ব পোশাকে অনেক ছাত্রও তখন হয়ত তাঁকে দেখতে পায়, দৃশ্যটা কল্পনা করেই তিনি নাকি শিউরে ওঠেন, এবং ইন্দ্রজিৎকে ডাকিয়ে বলেন, "এসব কী শুনছি হে?"

"কী শুনছেন সার?"

"তুমি নাকি রোজ মাঠে যাও?"

"রোজ না-গেলেও প্রায়ই যাই।"

"গিয়ে হাফপ্যান্ট পরে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মাঠে নামো?"

ও, এই ব্যাপার! ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেলেছিলেন, "কী করব সার, ধুতি পরে তো মাঠে নামবার নিয়ম নেই, তাই হাফপ্যান্ট না-পরে আর উপায় কী।"

"কাজটা ভাল করছ না হে।"

ইন্দ্রজিৎ বলেছিলেন, "কেন, এতে অন্যায় কী হল?"

"ন্যায়-অন্যায়ের কথা তো নয়," প্রবীণ সহকর্মী গম্ভীর গলায় রায় দিয়েছিলেন, "প্রশ্নটা হল সংগতি-অসংগতির। একদিকে তুমি একজন সম্মানিত অধ্যাপক, অন্যদিকে তুমি হ্যাফপ্যান্ট পরে, হাঁটু দেখিয়ে মাঠ-ময়দান চষে বেড়াচ্ছে, তোমার এই দুই ভূমিকায় আমি তো কোনও সংগতি দেখতে পাই না।"

সবচাইতে বড় 'অসংগতি' ছিল তাঁর ছাত্র-জীবনের ইতিহাসে। ইন্দ্রজিৎ যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন, আগেই সে-কথা বলেছি। যে-কথা বলা হয়নি, সেটা এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার মাস দুয়েক আগে বীরপুরের ইশকুল থেকে তাঁকে রাসটিকেট করা হয়েছিল।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মারাত্মক। হেডমাস্টার মশাইকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ। বলা হয়েছিল, বীরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমহেশচন্দ্র বসুকে খুন করবার জন্য তাঁরই ছাত্র, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, শ্রীইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় মধ্য-নিশীথে তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে ঢোকে, এবং নিদ্রিত প্রধানশিক্ষক মহাশয়কে তাঁর শয্যা থেকে তুলে নিয়ে ছাত্রাবাসের সংলগ্ন দিঘির মধ্যে নিক্ষেপ করে। মহেশচন্দ্র সাঁতার জানতেন না; কিন্তু পাড়ের কাছাকাছি জল ছিল অগভীর, তাই ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। যদি আর হাত-কয়েক দূরে নিক্ষিপ্ত হতেন, তা হলে আর তাঁর বাঁচবার কোনও আশাই ছিল না।

মহেশচন্দ্র কলকাতার মানুষ। হেডমাস্টারের চাকরি নিয়ে মাত্রই বছরখানেক হল তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়েছেন। পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে যাননি, ছাত্রাবাসের একটি ঘর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর বক্তব্য : ইন্দ্রজিৎ একা আসেনি, আরও অন্তত তিন-চারজন তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ঘরে যেহেতু আলো ছিল না, তাই তাদের কাউকেই তিনি চিনতে পারেননি। কণ্ঠস্বর থেকেও অবশ্য মানুষ চেনা যায়। এক্ষেত্রে যায়নি, তার কারণ, তারা কেউই কোনও কথা বলছিল না।

প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে তিনি ইন্দ্রজিৎকেই বা চিনলেন কী করে?

"আততায়ীর কণ্ঠস্বর আমি শুনিনি, তার মুখও আমি দেখিনি," মহেশচন্দ্র জানিয়েছিলেন, "কিন্তু তার বুকের আন্দাজ আমি পেয়েছিলুম। বিছানা থেকে তুলে আমাকে জানালার ধারে নিয়ে যাওয়া হল। বুঝতে পারলুম, আমাকে এবারে পুকুরের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। বুঝবামাত্র আততায়ীকে আমি প্রাণভয়ে জাপটে ধরি। আর তখনই টের পাই যে, তার সারা বুক রোমে ঢাকা।"

ইশকুল কমিটির সামনে বসে মহেশচন্দ্র সেই ভয়াবহ রাত্রির বিবরণ দিচ্ছিলেন। তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইন্দ্রজিৎ। খালি গা। স্নান করে সবে তিনি তাঁর ঘরে ফিরেছিলেন, এমন সময়ে দফতরী গিয়ে তাঁকে ডেকে এনেছে। যে-অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল; একটা গেঞ্জি পর্যন্ত পরে নেবার সময় তিনি পাননি।

মহেশচন্দ্র তাঁকে দেখছিলেন। এই তাঁর ইশকুলের সেরা ছেলে। রোজ তিন

মাইল পথ ঠেঙিয়ে, জলকাদা ভেঙে, যাকে ইশকুলে আসতে হয় শুনে তাঁর বড় মমতা হয়েছিল। টেস্ট পরীক্ষায় যার খাতা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এ-ছেলে জলপানি পাবেই। তাই, যাতায়াতে যাতে তার সময় নষ্ট না হয়, তার জন্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে যাকে তিনি বোর্ডিঙে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে তার কাছে রোজ সকালে পড়া বুঝে নিতে আসত। মাত্র দিন তিনেক আগেও, "হ্যাঁ রে, জলপানিটা পাবি তো" এই প্রশ্নের উত্তরে যে তাকে বলেছিল, "পেতে আমাকে হবেই, তা নইলে আমার কলেজে পড়া হবে না।"

সেই ছেলে তাঁকে পুকুরে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল কেন? মহেশচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। গোটা ব্যাপারটাই তাঁর একটা ধাঁধার মতো লাগছিল। বিষণ্ণ চোখে তিনি ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে ইশকুল-কমিটির প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কি আর-কিছু বলবার দরকার আছে?"

প্রেসিডেন্ট বললেন, "না, যেটুকু বলেছেন, অপরাধীকে সনাক্ত করবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।"

সদর-মহকুমার যিনি এস-ডি-ও, পদাধিকারবলে এই ইশকুলেরও তিনি প্রেসিডেন্ট। ইংরেজ আই-সি-এস অফিসার, বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু সিবিলিয়ান-মহলে ইতিমধ্যেই একজন দুঁদে শাসক হিসেবে তাঁর নাম হয়েছে—তীব্র চোখে তিনিও এতক্ষণ এই ছাত্রটিকে দেখে যাচ্ছিলেন। তিনিও শুনেছিলেন যে, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্রোধ পোষণের কোনও কারণই এর নেই। তাহলে এ ছেলে হেডমাস্টারকে খুন করতে গিয়েছিল কেন?

ইন্দ্রজিৎ অবশ্য স্বীকার করেননি যে, হেডমাস্টার মশাইকে তিনি খুন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা যদি তিনি না-ই চাইবেন, তাহলে অত রাত্রে তিনি কী জন্যে তাঁর ঘরে ঢুকেছিলেন, এবং জানালা দিয়ে তাঁকে পুকুরেই বা নিক্ষেপ করেছিলেন কেন,—মহকুমা-হাকিমের এই প্রশ্নেরও কোনও জবাব দেননি তিনি। আর কারা তাঁর সঙ্গে ছিল, তাও ইন্দ্রজিতের কাছে জানা গেল না। সম্ভব-অসম্ভব সর্বরকমের ভয় দেখানো হয়েছিল তাঁকে, প্রচণ্ডভাবে বেত মারা হয়েছিল, কিন্তু তবু তিনি টলেননি। গা কেটে যখন রক্ত পড়ছিল, তখনও এক ফোঁটা জল পড়েনি তাঁর চোখ দিয়ে। স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর, দাঁতে দাঁত চেপে, বিড়বিড় করে সারাক্ষণ বলে যাচ্ছিলেন, "কিছুই আমি বলব না...কিছুই না...।"

এস-ডি-ও'র সন্দেহ হয়েছিল, হয়ত কোনও রাজনৈতিক গুপ্ত-সংগঠনের হাত রয়েছে এর পিছনে। চাপা গলায় হেডমাস্টার মশাইকে তিনি জিজ্ঞেসও করেছিলেন, "য়ু ডোন্ট থিংক দি টেররিস্ট্স্ হ্যাভ এ হ্যান্ড ইন ইট?"

উত্তরে মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, না, তা তাঁর মনে হয় না।

"বাট হি ইজ দি কাল্প্রিট অলরাইট। ও-ই যে আপনাকে দিঘির মধ্যে ছুঁড়ে মেরেছিল, তা নিয়ে যখন কোনও তর্ক নেই, তখন তো আর ওকে পরীক্ষায় বসতে

দেওয়া চলে না।"

ইন্দ্রজিৎকে রাসটিকেট করে দেওয়া হল।

এক হাতে টিনের সুটকেশ, অন্য হাতে সতরঞ্চিতে জড়ানো একটা বালিশ, বোর্ডিং থেকে ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে এলেন। মহেশচন্দ্রের কাছে যখন বিদায় নিতে যান, তখন ইন্দ্রজিৎকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রুদ্ধ গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ কাজ তুই কেন করলি ইন্দ্র?" কিন্তু তখনও কোনও কথা বলেননি তিনি; শুধু নত হয়ে মহেশচন্দ্রকে প্রণাম করে, নীরবে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাস্তায় নেমে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, এখন তিনি কোথায় যাবেন? খাবাসপুরে যাওয়া চলে না। তাঁর মাতামহ আর মাতামহী ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। থাকবার মধ্যে ছিলেন শুধু এক মামা। মামা তাঁকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু এই অবস্থায় ফিরলে তাঁকে বিব্রত করা হবে কিনা, ইন্দ্রজিৎ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বাবার কথা মনে পড়ল। মনে হল, বাবাকে সব কথা জানানো দরকার। একবার ভাবলেন, চিঠি লিখে সব জানাবেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, না, চিঠিতে সব কথা বুঝিয়ে বলা যাবে না, তার চাইতে বরং কলকাতাতেই চলে যাই।

রেল-স্টেশন জেলা-শহরে। বীরপুর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, সমস্ত শরীরে কালসিটে পড়ে গেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে তিনি হাঁটতে লাগলেন।

রেলগাড়ির মধ্যেই কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিল ইন্দ্রজিতের। পরদিন যখন কলকাতায় পেঁছিলেন, তাঁর চোখ তখন টকটকে লাল, যন্ত্রণায় তাঁর মাথা তখন ছিঁড়ে পড়ছে। শৈশবে কলকাতা ছেড়েছিলেন, তার পরে এই তাঁর প্রথম আসা, শহরের রাস্তাঘাট কিছুই তিনি চিনতেন না। ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর দমকলের কথা তাঁর আবছা-আবছা মনে ছিল। এখন সেখানে বিনা-বাহনেই ঘটাং ঘটাং করে ট্রাম চলছে। দেখে তিনি অবাক। ভয় হল, এই বিশাল শহরে তিনি হারিয়ে যাবেন। হারিয়ে অবশ্য যাননি। ঠিকানাটা তাঁর সঙ্গেই ছিল; একে-ওকে-তাকে সেই ঠিকানা-লেখা চিরকুট দেখিয়ে, প্রশ্ন করতে করতে, এখানে-ওখানে ঠেক্ খেতে-খেতে তাই শেষ পর্যন্ত ঠিকই সিমলে-পাড়ায় এসে পেঁছে গেলেন।

লোকেশ্বর তখন বাসায় ছিলেন না। তিনি তখন বইয়ের দোকানে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে, সমস্ত শুনে, তিনি যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

ঠাকুমা বলেন, "তর ঠাকুর্দার অবস্থা তখন এক্কেরে পাগলের মতন। ছাওয়ালের বয়স যে তখন কুড়ি, তার উপরে আবার তার গায়ে যে তখন জ্বর, সেই খেয়াল পর্যন্ত তানার তখন ছিল না। আউলা-পাথারি তর বাবারে তো তিনি পিটাইতে

শুরু করলেন। পিটান আর কন, 'তুই আমারে ডুবাইয়া ছাড়লি...তুই আমারে ডুবাইয়া ছাড়লি।' পিটাইতে-পিটাইতে বোধ করি মাইরাই ফেলাইতেন, তর জাগীর-দাদা আইসা লাঠিডা কাইড়া লয়, তাই রইখ্যা।"

ওই প্রথম তাঁর ছেলের গায়ে হাত তুলেছিলেন লোকেশ্বর। ওই শেষ। মাত্র ওই একবারই তাঁর স্থৈর্য একেবারে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল।

কিন্তু তার জন্যে বোধ হয় খুব দোষও তাঁকে দেওয়া যায় না। খুব সম্ভব তাঁর মনে হয়েছিল যে, বন্দরে পৌঁছতে যখন আর দেরি নেই, তটরেখা যখন একটু-একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ঠিক তখনই—সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে—দেখা দিয়েছে তাঁর ভরাডুবির আশঙ্কা। অমন অবস্থায় কে না ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে!

রামজয়ের শরীর দিনে-দিনে ভেঙে পড়ছিল, তাই শেষের দিকে তিনি আর কলকাতায় আসতে পারতেন না। কিন্তু তখনও, ইন্দ্রজিতের খুঁটিনাটি খবর জানিয়ে, জামাতাকে তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি পড়ে বুকে বল পাচ্ছিলেন লোকেশ্বর। তাঁর মনে হচ্ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁকে নিরাশ করবে না। মনে হচ্ছিল, নিজের জীবনে যে সব আকাঙ্ক্ষা মেটাবার সুযোগ তিনি পেলেন না, তাঁর পুত্রের জীবনে একে-একে সেগুলি চরিতার্থ হয়ে উঠবে। সন্দেহ নেই, ইন্দ্রজিৎকে কেন্দ্র করে তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। নানা রকমের সোনালী স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন যে এমনভাবে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হবে, এ তাঁর কল্পনায় ছিল না।

বার বার ইন্দ্রজিৎকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বল্ হতভাগা, এখনও বল্, অত রাত্রে তুই হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলি কেন? কেন তাঁকে জানালা দিয়ে দিঘির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলি?"

ছেলে কোনও উত্তর দেয়নি।

বার বার তিনি জানতে চেয়েছিলেন, সে-রাত্রে আর কারা তার সঙ্গে ছিল।

ছেলে কোনও উত্তর দেয়নি।

মেরেছিলেন, অনুনয় করেছিলেন, তার পর হঠাৎ এক সময়ে ঝরঝর করে কেঁদেও ফেলেছিলেন লোকেশ্বর। কিন্তু ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে তবু একটি প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া গেল না।

চিত্তসুন্দরী এসে লোকেশ্বরের সামনে থেকে ইন্দ্রজিৎকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে মুখ তুলে একবার বাবার দিকে তাকালেন ইন্দ্রজিৎ। তারপর শান্ত গলায় বললেন, "বাবা, আপনার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার উপায় নেই, আপনার কোনও কথারই আমি জবাব দিতে পারব না; শুধু বিশ্বাস করুন, হেডমাস্টার মশাইকে আমি মারতে চাইনি।"

সে-রাত্রে আর ঘুমোতে পারলেন না লোকেশ্বর। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, ইন্দ্রজিৎকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, সেই ওষুধ খেয়ে ইন্দ্রজিৎ ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। কিন্তু লোকেশ্বরের চোখে আর ঘুম এল না। বিনিদ্র চোখে বিছানায়

উপরে সারাটা রাত ছটফট করতে লাগলেন তিনি। তারপর, পূবের আকাশে আলো ফুটতেই, চোখে-মুখে জল দিয়ে ইন্দ্রজিতের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তার কপালে হাত রাখলেন। দেখলেন, জ্বর নেই। তখন ইন্দ্রজিতের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁটতে পারবি?"

"পারব।"

"তাহলে চল্ আমার সঙ্গে।"

আকাশে আলো ফুটবার পরেও কলকাতার রাস্তা অনেকক্ষণ অন্ধকারে ডুবে থাকে। ভোরবেলার সেই অন্ধকারের মধ্যে ছেলের হাত ধরে লোকেশ্বর তাঁর বাড়ির থেকে বেরিয়ে এলেন। পথে তখনও লোক-চলাচল শুরু হয়নি। ভিস্তী তখন সুরকি-ঢালা পথের উপরে জল ছিটোচ্ছে।

ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, জীবনে ওই একবারই মাত্র ঈশানচন্দ্র ঘোষের কাছে তিনি প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে ঈশানচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা তখন সামান্য নয়। প্রেমচাঁদ বড়ালের গলি যেখানে কলেজ স্ট্রীটে পড়েছে, সেই মোড়ের কাছে তাঁর মস্ত বাড়ি। সিমলে-পাড়া থেকে বেরিয়ে, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে, পিতাপুত্র সেই বাড়িতে চলে এলেন। বাল্যবন্ধুর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে লোকেশ্বর বললেন, "ঈশান, আমাকে বাঁচাও।"

সমস্ত শুনে ঈশানচন্দ্র বললেন, "আমার দ্বারা হবার নয়। তবে উপায় তো একটা কিছু করতেই হবে। চলো, তোমাকে আশু মুখুজ্যের কাছে নিয়ে যাই।"

ঈশানচন্দ্রের সেদিন আর অন্য কাজে যাওয়া হল না। বন্ধু আর বন্ধুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, জুড়ি হাঁকিয়ে, তিনি আশু মুখুজ্যের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

সার আশুতোষ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর। পরনে খাটো ধুতি, তেল মেখে তিনি তখন স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। সেই অবস্থাতেই চুপচাপ তিনি ঘটনার বিবরণ শুনলেন; কিন্তু, অবাক কাণ্ড, এমন একটি কথাও তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, ইন্দ্রজিতের যাতে কোনও অস্বস্তি হতে পারে। শুধু বাঘের মতন জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "বুঝতে পেরেছি, অন্য কাউকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই এখন মরতে বসেছিস। তা ইশকুলে তো বরাবর ফার্স্ট হতি শুনলুম ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় কেমন হবে মনে হয়?"

অবাক হয়ে এই মানুষটিকে এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিলেন ইন্দ্রজিৎ। এবারে প্রশ্নের উত্তরে ম্লান গলায় বললেন, "যত ভাল হবে ভেবেছিলাম, তত ভাল বোধ হয় আর হবে না।"

"জলপানি পাবি?"

"পাবার জন্যে চেষ্টা করব।"

বাস্, আর কথা বাড়ালেন না সার আশুতোষ। বললেন, "যা, তবে চেষ্টা কর্ গিয়ে। তোকে যাতে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়, তার জন্যে আজই আমি

ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে একটা অর্ডার লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল আমার আপিসে এসে তার একটা নকল নিয়ে যাস্।"

লোকেশ্বরের মুখ দিয়ে কোনও কথা সরছিল না। বাইরে এসে ঈশানচন্দ্রকে বললেন, "ভাই, তুমি আমাকে রক্ষা করেছ।"

শুনে ঈশানচন্দ্র বলেছিলেন, "কী যে বলো। কে যে কাকে রক্ষা করে, এত চট্ করে তা বোঝা যায় না, লোকেশ্বর। চলো, তোমাকে সিমলে-পাড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বেলা বেড়েছে। পথে এখন অনেক লোক। সবাইকে খুব ব্যস্ত লাগছে। শূন্যে ছপ্‌টি ঘুরিয়ে ঈশানচন্দ্রের কোচোয়ান মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছে, "সরে যাও...সরে যাও।" ঘোড়ার খুরে ক্লপ্-ক্লপ্ শব্দ উঠছে। প্রথম যখন ইস্টিশানে এসে নেমেছিলেন, কলকাতাকে মোটেই ভাল লাগেনি ইন্দ্রজিতের। এখন কিন্তু একটু একটু করে ভাল লাগতে লাগল।

জুড়ি এসে সিমলে-পাড়ায় পৌঁছল। লোকেশ্বর আর ইন্দ্রজিৎ নেমে গেলেন। ঈশানচন্দ্র এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এইবারে লোকেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যশোরের কথা মনে পড়ে লোকেশ্বর? ন' বছর বয়সে আমি বাবাকে হারিয়েছি, আর তুমি হারিয়েছ বারো বছর বয়সে। আজ আমরা দু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু একদিন যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা একই রকমের কষ্ট পেয়েছিলুম, তা আমি ভুলিনি। লোকেশ্বর, তোমার দুঃখ যদি আমি না বুঝি, তবে ভগবানও বুঝবেন না।"

রাস্টিকেশনের হুকুম প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। কিন্তু ইন্দ্রজিতের আর বীরপুরে ফেরা হল না। লোকেশ্বরই ফিরতে দিলেন না। একবার ভেবেছিলেন, পরীক্ষার দিন-দুয়েক আগে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জেলা-শহরে যাবেন, তারপর পরীক্ষা শেষ হবামাত্র তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসবেন। কিন্তু ঈশানচন্দ্র বললেন, "না হে লোকেশ্বর, তার আর দরকার নেই; সেন্টার পালটাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, ও বরং কলকাতাতেই পরীক্ষা দিক।"

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বার হল। লোকেশ্বর সেদিন হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন। ইন্দ্রজিৎ জলপানি পেয়েছে।

॥ ৭ ॥

সকালের খাওয়া চুকে গেছে। দুপুরের রান্না বসতে এখনও অনেক দেরি। আম ছাড়িয়ে চান করতে যাব। তখন জাগীর-দাদা আর আমি আমাদের পুকুরের ধারে ডুবিয়ে-রাখা ডিঙি-নৌকোটাকে পাড়ের উপরে টেনে তুলব। নৌকোর ডরার মধ্যে বিস্তর ডালপালা দেওয়া আছে, মাছগুলো তার মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকে, আবার নৌকো যখন টেনে তোলা হয়, তখন ওই ডালপালাগুলো আছে বলেই মাছগুলো আর ছট্‌কে পালাতে পারে না। নৌকো টেনে, মাছ দিয়ে খালুই বোঝাই করে, বড়-কাকীমার হাতে সেই খালুইটা ধরিয়ে দিয়েই আবার দৌড় লাগাব পুকুরের দিকে। তারপর অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে, পুকুর থেকে উঠে এসে, এক দৌড়ে আমাদের ভিতর-বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াব। তারপর গা-মাথা মুছতে-মুছতে ভীষণ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করব, "রান্না হইছে?" বড়-কাকীমা অমনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলবেন, "অনে—ক ক্ষণ।" তারপর রান্নাঘরের দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে, আমার কাছে এসে, গামছাটাকে এক ঝটকায় আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, তার থেকে সমস্ত জল নিংড়ে বার করে দিয়ে, যত জোরে পারেন ঘষে-ঘষে আমার গা-হাত-পা মুছিয়ে দিতে দিতে বলবেন, "পাজী ছাওয়াল, জলে নামলে তুমি আর ওঠতেই চাও না, চক্ষু দুইডারে লাল কইরা ছাড়ছ। দাঁড়াও, কাইল-ই আমি হাটের থিক্যা পোস্টোকাঠ্ আনাইয়া বড়দিরে সব জানাইয়া একখান্ চিঠি লিখ্যা দিতেছি।"

কিন্তু চান করতে যেতে এখনও অনেক দেরি। এখন আমরা আম ছাড়াচ্ছি। বড়ঘরের খাটের তলা থেকে বেছে-বেছে আম বার করে আনা হয়েছে। একদিকে পাকা-টুকটুকে আমের ডাঁই, অন্য দিকে একটা মস্ত বারকোষ। মাঝখানে বসে আমি আর জাগীর-দাদা খোসা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। ঠাকুর্দা বলেন, 'খোসা ছাড়ানো'। ঠাকুমা বলেন 'চোক্‌লা ছোলা'। বলেন, "চোক্‌লাগুলারে এক জায়গায় রাখ, গোটা ঘরডারেই এক্কেরে আদাড় কইরা ছাড়িস না।" ঠাকুর্দা বলেন, "কোন্ ভাষায় যে তোমার নাতির সঙ্গে কথা বলছ, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। 'আদাড়' আবার কী বস্তু? 'ভাগাড়' জাতীয় কোনও ব্যাপার বুঝি?" শুনে ঠাকুমা বলেন, "বাজে কথা কইও না। কইলকাতার মাইন্‌ষেরেও আমি 'আঁস্তাকুড়' না কইয়া 'আদাড়' কইতে শুনছি।"

জাগীর-দাদা এই সময়ে একটা মন্তব্য করবার সুযোগ পেয়ে তাঁদের তর্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বলে, "জলন্‌ধরমে কিন্তু ই-সব কোথার একটাও চোলে না। উহা না 'আঁস্তাকুড়' বোলে, না 'আদাড়' বোলে।"

চোখ পাকিয়ে ঠাকুর্দা তাকে ধমক দিয়ে বলেন, "থাম্ ব্যাটা, একে তো এই বাঙালগুলোকে নিয়ে জ্বলছি, তার উপরে উনি আবার জলন্ধরী প্যাঁচ মারতে এলেন। যা করছিস কর্, চুপ করে খোসা ছাড়িয়ে যা।"

খোসা ছাড়ালেই অবশ্য কাজ ফুরয় না। আগে খোসা ছাড়াই, তারপরে একটা ধারালো ঝিনুক দিয়ে কুরে কুরে পোকায়-খাওয়া জায়গাগুলোকে বাদ দিই, তারপর সেই আম বারকোষে জমা হয়। বারকোষের পাশে বসে আছেন ঠাকুমা আর বড়-কাকীমা। আমগুলোকে নিংড়ে তাঁরা রস বার করছেন। সেই রস একটা পিতলের ডেকচির মধ্যে জমা হচ্ছে। এর পরে রাজ্যের কুলো, ডালা আর টুকরো-টুকরো চাটাইয়ের উপরে রস মাখিয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া হবে।

বাবা খুব আমসত্ত্ব খেতে ভালবাসেন। তাই নিয়েই কাল কথা হচ্ছিল। ঠাকুর্দা বলছিলেন, "আমসত্ত্ব এবারে একটু বেশী করেই করো। ইন্দ্র তো পুজোর সময়ে সবাইকে নিয়ে বাড়ি আসবে। কলকাতায় ফেরবার সময় অন্তত সের পনের আমসত্ত্ব ওর সঙ্গে দেওয়া চাই। নিজেরা খাবে, বন্ধুবান্ধবদেরও দু-চার টুকরো করে দিতে পারবে।"

বড়-কাকীমা বললেন, "আগের আমসইত্য ভাল হয় নাই মা, কুলার থিক্যা ছাড়াইতে গিয়া দেখি, ছিঁড়া ছিঁড়া যায়, আস্তা উইঠ্‌ঠা আসে না।"

ঠাকুমা বললেন, "আমসইত্যের আর দোষ কী, গোলা ঢালার আগে হাতে এট্টু ত্যাল মাখাইয়া কুলার পিঠে সেই হাতখান্ একবার ভাল কইরা সাপ্‌টাইয়া নিও, তাইলেই দ্যাখবা যে, আর কোনও গণ্ডগোল হইতেছে না, আমসইত্য এক্কেরে আস্তা-আস্তা উইঠ্‌ঠা আসবে।"

একটু আগেই ভুবন-দাদুর কথা হচ্ছিল। কাল সন্ধেয় যখন আইনদ্দী-কাকার সঙ্গে ছোট-বিষ্ণুপুরের হাট থেকে ফিরি, তখন কুসুমতলির চকের মধ্যে হঠাৎ ভুবন-দাদুকে দেখতে পেয়েছিলুম। চারদিকে ধু-ধু ধানখেত, তার মধ্যে কচ্ছপের পিঠের মতন এক-টুকরো উঁচু ডাঙা-জমি, আর-কিছুদিন বাদেই তো এই মাঠের উপর দিয়ে নৌকো চলবে, ওই ডাঙা-জমি কিন্তু তখনও তলিয়ে যাবে না। আইনদ্দী-কাকার কাছে শুনেছি যে, আগে ওখানে একটা মস্ত বড় পিপুল গাছ ছিল, ছাব্বিশ সনের ঝড়ে সেটা ভেঙে যায়, তার পরে আবার নতুন একটা গাছ গজিয়েছে। ভুবন-দাদু সেই গাছের তলায় বসে ছিলেন। মাঠে তেমন হাওয়া ছিল না, তবু পিপুলের পাতা থরথর করে কাঁপছিল। পশ্চিমের আকাশে তখন সূর্য ডুবছে, তার আলো পড়ে সাদাটে সবুজ রঙের পাতাগুলোকে লালচে দেখাচ্ছে, একটু বাদেই আকাশ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে, কুসুমতলির চকের মধ্যে তখন নাকি আগুনের গোলা ছুটোছুটি করে বেড়ায়, এই সব সময়ে মাঠের মধ্যে হাঁটতে আমার একদম ভাল লাগে না, বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে খাটের উপরে উঠে পড়তে পারলে বেঁচে যাই, তাই আইনদ্দী-কাকাকে বললুম, "এখন আর এইখানে দাঁড়াইও না, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো।"

কিন্তু আইনদ্দী-কাকা সে-কথা শুনল না। আল থেকে সেই উঁচু জমিতে

উঠে, মাথার ধামা মাটিতে নামিয়ে রেখে, গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, “দত্তচাচা এই সইন্‌ঝাবেলায় এইহানে কী করতাছেন?”

ভুবন-দাদু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, “কেডা তুমি?”

‘আমি মন্দারগেরামের পাশের গেরাম আলিকান্দার আইনদ্দী।”

“ও, তা গেছিলা কোথায়?”

“আপনাগো ঠাউর-বাড়ির নাতিডারে লইয়া ছোট-বিষ্টুপুরের হাটে গেছিলাম, অখন হাট কইরা বাড়ি ফিরতাছি। আপনে আমাগো লগে আসফেন নাকি?”

“না, তোমরা বাড়ি যাও,” ভুবন-দাদু বললেন, “আমি এট্টু জমিজমা দ্যাখতে বাইরাইছিলাম, একলাই ফেরতে পারব, তোমরা আমার জইন্যে চিন্তা কইরো না।”

এত কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, তবু আমাকে আর আইনদ্দী-কাকাকে তিনি দেখতে পেলেন না, এদিকে সেই মানুষ কিনা জমিজমা ‘দেখতে’ বেরিয়ে এই সন্ধেবেলায় একা-একা মাঠের মধ্যে বসে আছেন, ভাবতেই আমার গা-শিরশির করতে লাগল।

কাজল-দিদির কথা মনে পড়ল। দিন কয়েক আগে একদিন সন্ধের সময় মেঘু আর নেউলের সঙ্গে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছি, সেই সময়ে নিস্তার-বাগে হঠাৎ কাজল-দিদি আর কালাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নেউল জিজ্ঞেস করল, “কোথায় গেছিলা কাজল-দিদি?” উত্তরে কাজল-দিদি বলল, “মজুমদার-বাড়ির টিউকল থিকা জল আনতে গেছিলাম, অখন কালাদা আমারে এট্টু আউগাইয়া দিতেছে।” তারপর একটু থেমে বলল, “ভুবন-দাদুরে এই পথ দিয়া যাইতে দেখলি?” তাতে কালাদা হঠাৎ বলল, “আরে ধুত্‌, ওই বুইড়া কিছু দ্যাখতে পায় না।”

হাঁটতে হাঁটতে আইনদ্দী-কাকাকে জিজ্ঞেস করলুম, “ভুবন-দাদু তো দ্যাখতে পায় না আইনদ্দী-কাকা, তাইলে জমিজমা দ্যাখতে বাইরাইছে কইল ক্যান্‌?”

শুনে আইনদ্দী-কাকা হো হো করে হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, “বুইড়ার চক্ষু দুইডা তো আগেই নষ্ট হইছিল, অখন মাথাডাও এক্কেরে ব্যাবাক নষ্ট হইয়া গেছে।”

রাত্তিরবেলায় যখন খেয়েদেয়ে শুতে যাই, তখন ঠাকুমা আমাকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেন, দেড়-আঙুলে পালোয়ানের গল্প বলেন, কোন্‌ এক দুষ্টু রাজাকে বুদ্ধির খেলায় জব্দ করে যে তার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, সেই ট্যাটোন’-এর গল্প বলেন। কাল রাত্তিরে রামায়ণের গল্প হচ্ছিল। রাজা দশরথ কীভাবে হরিণ জল খাচ্ছে ভেবে তাঁর শব্দভেদী বাণ দিয়ে অন্ধ-মুনির ছেলেকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই গল্প। তা যেই না ঠাকুমা অন্ধ-মুনির কথা বলেছেন, অমনি আমার ভুবন-দাদুর কথা মনে পড়ে গেল। কুসুমতলির চকের মধ্যে পিপুল গাছের তলায় একা একটা মানুষ বসে আছে, পড়ন্ত রোদ্দুরের আলো পড়ে সব-কিছুকে লালচে দেখাচ্ছে, কোথায় রামায়ণের গল্প শুনব, তা নয়, সন্ধে-বেলায় দেখা সেই দৃশ্যটাই বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

শ্নেছিল্ম, কী একটা মামলায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে তারপর সাক্ষীর কাঠগড়াতেই ভুবন-দাদ্ অন্ধ হয়ে যান। একবার ভাবল্ম, ঠাকুমাকে সেই গল্পটা বলতে বলি। কিন্তু কুস্মতলির চকের কথা মনে পড়তেই আবার আমার কেমন যেন গা-ছমছম করতে শ্রু করেছিল। তাই ঠাকুমাকে তখন আর কিছ্ বলল্ম না। ভাবল্ম, রাত্তির কাটুক, স্র্য উঠ্ক, তারপর সকালবেলায় বরং ঠাকুমাকে সব জিজ্ঞেস করা যাবে।

প্বের ঘরের মেঝেয় বসে আম ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করল্ম, "ভুবন-দাদ্ কী কইরা অন্ধ হইয়া গেল ঠাকুমা?"

ঠাকুমা বললেন, "ক্যান, তোরে কই নাই? অমন কাণ্ড সইত্য, ত্রেতা আর দ্বাপরে হইলেই মানাইত। মাইনষের কথার তখন এট্টা দাম ছিল, সইত্য-মিথ্যার এট্টা বিচার ছিল, দ্ষ্টামি করলে তার শাস্তি হইত, পাপ কইরা কারও সাইরা যাবার উপায় ছিল না, পাপের ফল এক্কেরে হাতে হাতে ফলত।"

ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানতে টানতে ঠাকুর্দা আমাদের আম ছাড়ানো দেখছিলেন। ঠাকুমার কথা শ্নে তিনি বললেন, "ফল তো এই কলিকালেও ফলল।"

ঠাকুমা বললেন, "সেইজন্যেই তো পেত্যয় হইতে চায় না।"

বড়-কাকীমা বললেন, "কী হইছিল মা?"

"সেই কথাই তো কই। সিকদার-বাড়ির ফইটকারে চেনো তো? ওর বাবা বৈকুণ্ঠ সিকদার মোটেই স্বিধার লোক ছিল না। ল্ভী মান্ষ, স্দের কারবার করত, তিন টাকা ধাব দিয়া পাঁচ টাকা ল্যাখাইয়া লইত, এইভাবে যে কত মাইনষের সব্বনাশ করছে, তার আর ল্যাখাজোখা নাই। একবার তো ছোট মিত্তির-বাড়ির বিশ্বনাথ মিত্তিরবে তার মাইয়ার বিয়ার সময় এক শো টাকা হাওলাত দিছে। কথা ছিল, এক বচ্ছরের মইধ্যে স্দ-স্দ্ধা সেই টাকা তারে শোধ কইরা দিতে হবে। তো মিত্তিরমশাই যখন কিছ্তেই আর টাকা জোগাড় কইরা ওঠতে পারেন না, তখন, কী আর করেন, কুস্মতলির চকে তো তানার কিছ্ ধানের জমি ছিল, সেই জমি তিনি বেইচা দিলেন। জমি-বেচার টাকায় তিনি নাকি সিকদার মশাইর পাওনাব টাকা শোধও কইরা দিছিলেন। কিন্তু দিলে কী হয়, বৈকুণ্ঠ সিকদার সেকথা স্বীকার গেল না, আদালতে গিয়া নালিস দিয়া বসল যে, টাকা সে পায় নাই। তখন মিত্তিরমশাই তো পড়লেন মস্ত বিপদে। টাকা নেবার কালে খত্ লিখা দিছিলেন, কিন্তু টাকাডা ফেরত দেবার কালে সেই খত্ আর ফেরত নেওয়া হয় নাই, কিন্তু আদালত তো আর সে-কথা শোনবে না। এখন উপায়?"

জাগীর-দাদার আম ছাড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমাকে সে জিজ্ঞেস করল, "কোই উপায় বাহার হ্য়া?"

ঠাকুমা বললেন, "সেই কথাই তো কই। কার যে কখন কী মতিচ্ছন্ন হয়, বোঝবার উপায় নাই। কত চোর সাধ্ হইয়া যায়, আবার কত সাধ্ পা পিছলাইয়া গর্তে পড়ে। এই যে ভুবন দত্তরে তোরা দেখিস, আইজ ওরে সক্কলে ঘেন্না করে, ওর ছায়া দ্যাখলেও দ্রে সইরা যায়, কিন্তু শ্নছি, এককালে এই গের্দের মইধ্যে

নাকি ওর মতন সোজা-বুঝের সইত্যবাদী লোক আর এট্টা ছিল না। তা আদালতে দাঁড়াইয়া মিত্তিরমশাই কইলেন, আমি যখন বৈকুণ্ঠ সিকদাররে টাকা ফেরত দেই, তখন ভুবন দত্তও সেইখানে বইসা ছিল, সব সে দ্যাখছে, অখন সে যা কয়, তাই আমি মাইনা লইতে রাজী। তখন ভুবন দত্তরে তো সাক্ষী দিতে ডাকা হইল। হাকিম তারে জিজ্ঞাস করল, 'বিশ্বনাথ মিত্তিররে তুমি টাকা ফেরত দিতে দ্যাখছ?' ভুবন দত্ত তো পেরথমে কিছু কইতেই চায় না, শ্যাষে হাকিম তারে ধমক দিতে আমতা-আমতা কইরা কইল, 'না, আমি কিছু দেখি নাই।' আর তারপরেই সেই কান্ড। সাক্ষীর কাঠগড়ার থিক্যাই সে চিকখুর দিয়া ওঠল, 'দেখি না...দেখি না...কিচ্ছুই আমি দেখি না...হায় ভগমান, এ তুমি আমার কী করলা?' কিন্তু তখন আর ভগমানরে ডাইকা কী হবে।"

ঠাকুর্দা বললেন, 'তা ভগবান শুধু ভুবন দত্তকেই বা শাস্তি দিতে গেলেন কেন? বৈকুণ্ঠ সিকদারকেও তো দিতে পারতেন।"

ঠাকুমা বললেন, "দ্যান নাই, এমন কথাই বা কী কইরা কও? এক-একজনরে তিনি এক-একভাবে শাস্তি দ্যান। বৈকুণ্ঠ সিকদারের ছাওয়াল ফইটকা তো এট্টা অমানুষ, মরার আগে বাপডারে এট্টু চিকিচ্ছা পর্যন্ত করাইল না. তা ধইরা নেবার পারি যে, সেইডাই শাস্তি। এদিকে ভুবন দত্তর শাস্তিডা তো সক্কলে চোখের উপরেই দ্যাখল। লাঠিতে ভর দিয়া সারা উঠান ঘুইরা বেড়াইত, আর কইত, 'আ-হা-হা-হা-হা। যা দেখার জইন্যে ভগমান আমারে চক্ষু দিছিলেন, সেই সইত্যডাই আমি দ্যাখলাম না, আর তাই ভগমান আমার চক্ষু দুইডা নিভাইয়া দিছেন, সইত্য-মিথ্যা কিছুই আর আমার দেখার উপায় নাই।"

ঠাকুর্দা বললেন, "কিন্তু এটাকে তোমরা একটা দৈব ব্যাপার বলেই বা ভাবছ কেন? ইন্দ্র সেদিন একটা বিলিতী ম্যাগাজিন পাঠিয়েছে। তাতেও ঠিক এই রকমেরই একটা ঘটনার কথা পড়ছিলুম। খেলার মাঠে বছর দশেক আগে একটা লোক হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর এই মাস কয়েক হল সে তার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পেয়েছে। ডাক্তাররা বলছে, ভীষণ কোনও আবেগ কিংবা উত্তেজনার কারণ ঘটলে এইভাবে দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ নষ্ট হওয়াটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়; আবার অনেক ক্ষেত্রে সেটা একটু একটু করে ফিরেও আসে।"

ঠাকুমা বললেন, "আহা, ভুবন দত্তেরও ফির্যা আসুক। অনেক দিন ধইরা তো শাস্তি ভোগ করল, আর ক্যান। লোকটারে দ্যাখলে বড় কষ্ট হয়।"

আমের খোসা, আঁটি, আর ঝিনুক-দিয়ে-কুরে-নেওয়া পোকায়-খাওয়া বাতিল অংশগুলি ওদিকে স্তূপাকার হয়ে জমে উঠেছে। পোকাগুলো সেই স্তূপের ভেতর থেকে গুটিগুটি বার হয়ে আসছে। কালো রঙের ছোট ছোট পোকা, দেখতে অনেকটা কচ্ছপের মতো। চারপাশে মাছি ভনভন করছে। জ্বলজ্বলে নীলচে রঙের, বড় সাইজের মাছি। শুধু এই আম-কাঁঠালের সময়েই এগুলো কোত্থেকে যেন উড়ে আসে, অন্য সময়ে এদের দেখতে পাই না। আমাদের বাড়িতে কাঁঠাল গাছ নেই। বাবা আম খেতে খুব ভালবাসেন, কিন্তু কাঁঠাল তাঁর দু-

চক্ষের বিষ। ঠাকুর্দা তাই কাঁঠাল গাছ লাগাননি। অন্য ফলের গাছ অবশ্য অনেক। লিচু, জাম, জামরুল, পেয়ারা, ডালিম, কত আর নাম করব। একটা গাবগাছও ছিল। বিলিতী গাবগাছ, ঠাকুর্দা খুব শখ করে সেটাকে লাগিয়েছিলেন। গত বর্ষায় সেটা মরে গেল। এবারকার ঝড়েও আমাদের অনেক গাছ পড়ে গেছে। একটা নারকোল গাছও গেল। জাগীর-দাদা বলছিল, নারকোল গাছ কখনও ঝড়ের কাছে জব্দ হয় না, এটার শেকড়ে আসলে পোকা লেগে গিয়েছিল। ঠাকুর্দা বলেন, অন্য গাছ নিয়ে তো ভাবনা নেই, কলমের আমগাছগুলো যে বেঁচে গেছে, এই ঢের। কলমের গাছগুলো একটু বেঁটে-মতন; কিন্তু তাতে আম নেহাত কম হয় না। মিষ্টিও খুব। তার উপরে আবার আমাদের ভিতরের উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে গাছটা আছে, তাতে দু' রকমের আম হয়। একই গাছে লম্বা আর গোল, দু' রকমের আম, দেখতে দারুণ মজা।

আমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এই সব কথা ভাবছি, এমন সময় ঠাকুমা বললেন, "আইজকার মতন থাউক। যা গোলা হইছে, তা-ই আগে দিয়া উঠি, কাইল আবার তোরা আম ছাড়াইয়া দিস। যা, অনেক বেলা হইল, অখন নৌকা টাইনা এট্টা ডুব দিয়া আয়।"

শুনে আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। বড়-কাকীমা ধমক দিয়ে বললেন, "কই যাইস? দাঁড়া, আগে তোর মাথায় ত্যাল দিয়া দেই, চুলগুলা তো কাউয়ার বাসা হইছে। পুকুরে যাওয়ার কথা শোনলে আর জ্ঞান থাকে না।"

ঠিক এই সময়ে দক্ষিণের পালানের ওদিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ : "বউ পলাইছে...বউ পলাইছে...ও অমু, শিগগির আয়..."

ঠাকুমা বললেন, "কেডা ডাকে? নেউলের গলা না?"

শুনবামাত্র এক লাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে পড়ে আমি দক্ষিণের দিকে দৌড় লাগালুম। নেউল ততক্ষণে পালান থেকে মাঠে নেমেছে। তার সংগে রয়েছে মেঘু। দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরে ফেলতেই সামনের দিকে আঙুল তুলে নেউল বলল, "ওই দ্যাখ।"

দেখি, হালোটের উপর দিয়ে সত্যবালা হিজলকান্দার দিকে দৌড়চ্ছে। শাড়ি পরে তো আর ছোটা যায় না, তাই পরনের শাড়িখানাকে খুলে নিয়ে পাগড়ির মতো করে মাথায় বেঁধেছে সত্যবালা। দেখে আমার বেদম হাসি পেল।

মেঘু বলল, "মাইয়ার খুব বুদ্ধি।"

নেউল বলল, "মহা শয়তান, ফাঁক পাইলেই আর কথা নাই, বাপের বাড়ির দিকে দৌড় লাগায়।"

কিন্তু দৌড়ে আমাদের সংগে পারবে কেন। পাঁচ বছরের একরত্তি মেয়ে তো, একটু বাদেই সত্যবালাকে আমরা ধরে ফেললুম। তখন তার কী কান্না। হালোটের উপরে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে আর বলে, "আমারে ছাইড়া দ্যাও, আমি আমার মা'র কাছে যাব।"

সেই অবস্থায় তাকে টেনে-হিঁচড়ে আবার বাড়ির দিকে নিয়ে আসছি, এমন

সময় পথের মধ্যেই নেউলের বাবার সঙ্গে দেখা। ভরত-কাকা তার ট্যাঁকের থেকে একটা কদ্‌মা বার করে, সত্যবালার হাতে গ‍ুঁজে দিয়ে, তাকে কাঁধে চড়িয়ে বলল, "কাইন্দো না মা, কাইন্দো না। আউজকার দিনডা আমাগো এইহানে থাকো, কাইলই তোমারে হিজলকান্দায় দিয়া আসব।"

সত্যবালা তখন কান্না থামিয়ে, কদ্‌মাটাকে ম‍ুখের মধ্যে প‍ুরে দিয়ে, নেউলকে দেখিয়ে বলল, "ওই পাজীডা আমারে এট্টা কিল দিছে।'

শ‍ুনে ভরত-কাকা তো রেগে আগ‍ুন। চোখ পাকিয়ে নেউলকে বলল, "কী, তর এত সাহস, তুই বউরে ধইরা কিলাস? হারামজাদা, তর হাতখান আমি আইজ কাইট্টা ফেলাব।"

নেউল আর এই কথার পরে বাড়ি গেল না। বলল, "চল অম‍ু, তোগো প‍ুকুরে গিয়া নৌকাডারে টাইনা তুলি।" তারপর প‍ুকুরের দিকে যেতে যেতে বলল, "বিয়া কইরা ভাল কাম করি নাই। মহা শয়তান মাইয়া।"

মেঘ‍ু আর দাঁড়াল না। বাড়ির দিকে ছ‍ুটতে ছ‍ুটতে চেঁচিয়ে বলে গেল, "তোরা গিয়া প‍ুকুরে নাম, আমি গামছাডা লইয়া আসি।"

প‍ুকুরে গিয়ে দেখি, জাগীর-দাদা একাই আমাদের ডিঙি-নৌকোটা টেনে তুলে ফেলেছে। আমাদের দেখে বলল, "আজ দোঠো মিরকিল মিলা।"

জাগীর-দাদা মিরগেলকে বলে মিরকিল। ঠাকুর্দাও তেমনি টাকিমাছকে বলেন ল্যাটা আর রয়নাকে বলেন ন্যাদোস। শ‍ুনে আমার যে কী হাসি পায়, সে আর কী বলব!

প‍ুকুরের ধারে আমাদের সিঁদ‍ুরে আমের গাছ। তার একটা ডাল খানিকটা উপরে উঠেই জলের দিকে এগিয়ে গেছে। ছায়া পড়ে প‍ুকুরের জল সেখানে কালো হয়ে আছে। ভাবছিল‍ুম যে, ওই ডালটায় উঠে শ‍ুন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে প‍ুকুরের মধ্যে পড়ব, কিন্তু নেউল আমাকে উঠতে দিল না। বলল, "চল্ গিয়া ঘাটলায় বসি, তর সঙ্গে আমার এট্টা কথা আছে।"

'কী কথা' জিজ্ঞেস করলেই যে নেউল অমনি 'ব্যাঙের মাথা' বলে হেসে উঠবে, তা কি আর আমি জানি না? এটা আমাদের প‍ুরনো খেলা, অনেকবার খেলেছি, তব‍ু নেউল আমাকে বোকা ঠাউরে সেই খেলার মধ্যে টানছে দেখে আমার খ‍ুব মজা লাগল। 'কী কথা' না বলে তাই ঘ‍ুরিয়ে বলল‍ুম, "কথাডা কী শ‍ুনি?" কিন্তু তার উত্তরে ঘাটলায় বসে নেউল যা বলল, তাতে আমি অবাক হয়ে গেল‍ুম।

"আমি আর এইহানে থাকবার চাই না।"

বলল‍ুম, "কই যাবি?"

নেউল সে-কথার তক্ষ‍ুনি কোনও জবাব দিল না। জিজ্ঞেস করল, "কইলকাতার জ্যাঠামশাই কবে দ্যাশে আসবে রে?"

"প‍ুজার ছ‍ুটির আগে না।"

"আইলে আমি তানার সঙ্গে কইলকাতায় চইলা যাব।"

"ক্যান্, এইহানে থাকতে তর মন লয় না?"

"না, বাবায় খালি মারে। তোগো কইলকাতার বাড়িতে তো থালা-বাসন মাজনের, হাট-বাজার করনের লোকের দরকার হয়, তা জ্যাঠামশাই আইলে কইস যে, আমি তো এহন বড় হইছি, হে কাম কইরা দেবার পারব।"

"সইত্যবালারে ছাইড়া থাকবার পারবি?"

"ওডা এট্টা মহা শয়তান।"

"মা আর বাবারেও তো ছাইড়া থাকবি। তর কষ্ট হইব না?"

"তুইও তো তর মা আর বাবারে ছাইড়া আছস। তর কষ্ট হয়?"

নেউলের কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ধ্বক করে উঠল। মনে হল, অনেকদিন আমি মা আর বাবাকে দেখিনি। দিদিকে দেখিনি। ছোট-পিসিকে দেখিনি। বাবা আমাকে যে তিন-চাকার সাইকেলটা কিনে দিয়েছিলেন, সেটায় এখন কে চড়ে? বাবার তো রোজ বাড়িতে ফিরতে রাত হতো। এক-এক দিন আমার ঘুম আসত না। মায়ের সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতুম। রাত হয়েছে। লোকজন নেই। গাড়িঘোড়াও চলছে না। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। তারই মধ্যে এক সময়ে দেখতে পেতুম, হাতের লাঠিটাকে শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বাবা আসছেন। অনেক দূর থেকে তাঁকে দেখা যেত। তখন এক ছুটে নীচে নেমে আমরা দরজা খুলে দিতুম। বাবার হাতে কিছু-না-কিছু জিনিস থাকতই। সেগুলিকে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে, আমাকে কোলে নিয়ে, বাবা জিজ্ঞেস করতেন "কী রে ন্যাওটা, ঘুমোসনি?"

সকালে খুব রোদ উঠেছিল। এখন আবার আকাশ মেঘলা হয়ে এসেছে। চড়বড় করে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। পেয়ারা গাছের ওদিকে দাঁড়িয়ে আমাদের চাঁদ-কপালী কালো গাইটা ঘাস খাচ্ছিল, বৃষ্টি নামতেই ল্যাজ তুলে হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে সেটা বাড়ির দিকে ছুট লাগাল। পুকুর জুড়ে রুপোর মতন খই ফুটতে থাকল। তার মধ্যে মেঘু এসে বলল, "শুনছিস?"

বললুম, "কী?"

"মানিক-দাদা তো ফিরা আইছে।"

"আর যমুনা-দিদি?"

গম্ভীর হয়ে গিয়ে মেঘু বলল, "মানিক-দাদারে শোনলাম হেই কথাডাও জিগানো হইছিল। তা মানিক-দাদা কইল, 'আমি তো হায়ার হইয়া রসুলপুরে ফুটবল খ্যালতে গেছিলাম, সেইহানে তিন দিন থাইকা তারপর বাড়ি ফিরতাছি। যমুনার কথা আমারে জিগাও ক্যান?'"

চুপচাপ আমরা ঘাটলার উপরে বসে রইলুম। বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু মেঘ একটুও কাটেনি। সারা আকাশ মেঘে ছাওয়া। এক্ষুনি আবার ঝুপ করে বৃষ্টি নামতে পারে। পুকুরের জল এই সময়ে কালো হয়ে যায়। আকাশে যখন রোদ্দুর ছিল, তখন সিঁদুরে-আমগাছের ডালটা যেখানে জলের উপরে ঝুঁকে থাকে, শুধু সেই জায়গার জল কালো দেখাচ্ছিল। এখন আর সেই জায়গাটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

॥ ৮ ॥

ভেবে এক এক সময়ে অবাক হয়ে যাই যে, জীবন নামক এই ব্যাপারটা কী বিচিত্র! কত 'যদি', কত 'কিন্তু', কত আকস্মিকতার সূত্র ধরে সে বয়ে চলেছে। কে যেন একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, ক্লিওপেট্রা যদি খর্বনাসা রমণী হতেন, সভ্যতার ইতিহাসই তাহলে পালটে যেত। কীটস্ সম্পর্কেও একবার এই রকমের একটা মন্তব্য দেখেছিলুম। 'হ্যাড কীটস্ বীন সিক্স ইনচেস টলার'—প্রণয় তাহলে হয়ত অতটা দুঃখ তাঁকে দিত না, এবং সেক্ষেত্রে হয়ত আরও অনেক দিন তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।

কিন্তু অত বড় বড় ব্যাপার নিয়েই বা মাথা ঘামাবার দরকার কী, আকস্মিক নানা ঘটনা আর যোগাযোগের প্রভাব কি আমাদের মতো মামুলী মানুষদের জীবনেই কিছু কম? এই যে আমি আলোর সমুদ্রে সারাটা দিন সাঁতার কেটে বেড়াই, এই যে আমি সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে আকাশের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, আবার সূর্যাস্তের সময়ে এই যে এক-এক দিন আমার মন খারাপ হয়ে যায়, এই যে আমি বাজারে যাই, আপিস করি, ছেলে পড়াই, আড্ডা দিই, তর্ক করি, ছুটিছাটায় জামতাড়া কি শিমুলতলায় বেড়াতে যাই, এই যে কেউ আমাকে দেখবামাত্র মুখ ফিরিয়ে নেয়, আবার কেউ-বা আমাকে দেখলেই আর-একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এই যে আমি নিজেই কতজনকে দূরে ঠেলছি, বুকে টানছি, দুঃখ দিচ্ছি, ভালবাসছি—কত অসংখ্য 'যদি' রয়েছে এর পিছনে।

কী হতো, লোকেশ্বর যদি না তাঁর মানকরের আত্মীয়স্বজনদের চক্রান্তে সেদিন ভিটে ছেড়ে কলকাতার দিকে রওনা হতেন? কী হতো, যদি না কলকাতায় এসে বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানির চাকরি নিতেন তিনি? কী হতো, যদি না রামজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই বইয়ের দোকানে অমন আকস্মিকভাবে তাঁর দেখা হয়ে যেত? কিংবা কী হতো, যদি না পাঁচ বছরের ছেলে ইন্দ্রজিৎকে খাবাসপুরে রেখে সেদিন প্রায় সওয়া শ' মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরতেন? কোথায় থাকতুম তাহলে আজ আমি?

আঠারো শ' সাতানব্বুই সন তো সত্যিই এমন কিছু দূরবর্তী দিবস নয়। মাত্রই পঁচাত্তর বছর আগের ব্যাপার। তার অনেক আগেই তো পূব-বাংলার নরম মাটিতেও রেলের লাইন পাতা হয়েছিল। তবু কেন পদ্মাপার থেকে লোকেশ্বর সেদিন পায়ে হেঁটে কলকাতায় ফিরেছিলেন? রেলের টিকিট কেনবার মতো টাকা ছিল না, তাই? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন সেই রোমাঞ্চকর প্রত্যাবর্তনের গল্পটা তাঁর

নিজের মুখেই একদিন শুনেছিলুম বটে, কিন্তু প্রশ্নটা তাঁকে আর করা হয়নি। উত্তরটাও তাই কোনও দিনই জানা যাবে না।

আমি শুধু এইটুকু জানি যে, লোকেশ্বর যদি না পূব-বাংলা থেকে সেদিন পদব্রজে কলকাতায় ফিরতেন, তাহলে রাত্রিবাসের জন্যে পদ্মাপারে এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে তাঁর আশ্রয় নেবার দরকার হতো না। সেই গৃহস্থের নাম গঙ্গাধর চক্রবর্তী। তিনি আমার মাতামহ। তাঁর প্রথম স্ত্রী তখন জীবিত। কিন্তু তাঁর কন্যা তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি।

সেকালে আলাপ-পরিচয়ের প্রথম পর্বেই বিনা দ্বিধায় 'আপনারা?' বলে একে অন্যের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেন ; ফলে পরস্পরের পরিচয় জানতে কোনও অসুবিধে ছিল না, গাঁঞী-গোত্র-মেলের ব্যাপারটা চটপট জানা হয়ে যেত। লোকেশ্বর আর গঙ্গাধরের ক্ষেত্রেও এই সাবেকী প্রথার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। দুজনেই জেনে গিয়েছিলেন যে, পরস্পরের তাঁরা পালটি-ঘর। রাজ-এস্টেটের কাজের সূত্রে গঙ্গাধরকে কোচবিহারে থাকতে হতো। দিন-কয়েকের ছুটিতে তিনি তখন গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। লোকেশ্বরকে অতিথি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি। ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, গঙ্গাধর খুব মজলিসী মানুষ ছিলেন। সেই রাত্তিরেই প্রজাদের ডাকিয়ে, পুকুরে জাল ফেলিয়ে, তিনি মাছ ধরাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, অতিথির আদর-আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখেননি। তারপর সকালবেলায় ঠাকুর্দা যখন বিদায় নিচ্ছেন, তখন তাঁর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন যে, এ-যাত্রায় তো কিছুই যত্ন আত্তি করা গেল না, আর-কিছু না হোক, অন্তত এই ত্রুটি সংশোধনের একটা সুযোগ দেবার জন্যেও পরে একবার তাঁকে চক্রবর্তী-বাড়িতে এসে উঠতেই হবে।

এর পনর বছর বাদে গঙ্গাধরের একখানা চিঠি পান লোকেশ্বর। গঙ্গাধর তাতে তাঁর কন্যার সঙ্গে লোকেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেন। "মহাশয়ের নিকট তাঁহার পুত্রের কথা শুনিয়াছিলাম, অদ্যাপি তাহার বিবাহ না হইয়া থাকিতে পারে বিবেচনায় অত্র পত্র লিখিতেছি।"—এই সূচনার পরে চিঠির উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, "চাটুজ্যে মহাশয়, অধিক কিছু লিখিতে চাহি না, আপনি পশ্চিমবঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, সুতরাং পদ্মাপারের মানুষদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সংশয় কিংবা সংস্কার আপনার থাকিতেই পারে, তবে কিনা মহাশয় স্বয়ং যখন 'বাঙাল-দেশে' বিবাহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন যে, মানুষ হিসাবে আমরাও কিছু খারাপ নহি।"

এই চিঠি পাবার পরেই দিন-কয়েকের ছুটি নিয়ে লোকেশ্বর বেরিয়ে পড়েন, এবং কন্যা দেখে, বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করে ফের কলকাতায় ফেরেন। ইন্দ্রজিৎ তখন হেরম্ব মৈত্রের কলেজে আই-এ ক্লাসের ছাত্র। শুনেছি, হবু-জামাতা যে জলপানি পাওয়া ছেলে, স্রেফ এই খবর শুনেই গঙ্গাধর চক্রবর্তী মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। 'বাবাজীবন'কে স্বচক্ষে এসে একবার দেখবারও কোনও দরকার বোধ করেননি।

আগেই বলেছি, মা যখন এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসেন, আমার বড়-কাকা আর মেজো-কাকা তখন নেহাত শিশু। আমার ছোট-কাকার নাম বিশ্বজিৎ আর ছোট-পিসির নাম দয়াবতী। তাঁদের তখন জন্মই হয়নি।

গ্রামের মেয়ে সুহাসিনী শহরে এলেন। গঙ্গাধর চক্রবর্তী বিত্তবান মানুষ, উপরন্তু শৈশবে-মাতৃহারা কন্যাটির প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না, তাই আপাদ-মস্তক তাকে তিনি অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তার মাস কয়েক বাদেই আমার সেজো-পিসিমা বিদ্যাবতীর জন্য পাত্র স্থির করলেন লোকেশ্বর, পুত্রবধূর অলঙ্কার দিয়ে কন্যাকে সাজিয়ে তাকে স্বামী-গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুমাব কাছে শুনেছি, তোরঙ্গ থেকে মা যখন তাঁর গহনার বাক্স বার করে দেন, ঠাকুর্দার চোখে তখন জল এসে গিয়েছিল। পুত্রবধূর মাথায় হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, "যা দিচ্ছ, তা আবার চতুর্গুণ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে।"

প্রথম যেবার মামাবাড়ি যাই, আমার বয়স তখন চার বছরও হয়নি। দাদা-মশাই তখন বেঁচে ছিলেন। ওই একবারই তাঁকে আমি দেখেছি। সেবারকার কথা খুব স্পষ্ট করে আমার মনে নেই। শুধু আবছা আবছা কিছু ছবি এখনও চোখে ভাসে, আবছা আবছা কিছু কথা এখনও শুনতে পাই। মাঝ-রাত্তিরে আমাদের ট্রেন একটা ইস্টিশানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির মধ্যে আলো নেই; জানালার বাইরে—লাল কাঁচের ঘেরাটোপের মধ্যে—টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছিল, তা ছাড়া সব আবছামতন অন্ধকার। একটানা ঝিঁঝি ডাকছিল, ট্রেনের বাইরে মস্‌মস্‌ শব্দ তুলে কারা যেন পায়চারি করছিল, তারই মধ্যে কে যেন খুব গম্ভীর গলায় টেনে-টেনে বলল, চু—য়া—ডা—ঙা। হঠাৎ একটা হুইস্‌ল শুনলুম, আর তারপরেই সবাইকে চমকে দিয়ে উলটো দিক থেকে আর-একটা রেলগাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে গেল। তার একটু বাদে ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজল, আর আমাদের গাড়িটাও অমনি একটা গা-ঝাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।

মা আমাকে জানালার ধারে বসতে দেন না। কিন্তু তিনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই আমি এক ফাঁকে জানালার ধারে গিয়ে বসেছিলুম। তখন মস্ত একটা নদী দেখেছিলুম, মনে পড়ে। গাড়ি যখন নদীর উপর দিয়ে যায়, তখন তার ঝক্‌ঝক্‌ শব্দটা হঠাৎ পালটে গিয়ে গম্‌গম্‌ করে শব্দ হতে থাকে। সেই শব্দটা এখনও শুনতে পাই।

ইস্টিশান থেকে মামাবাড়ি খুব কাছে। সকালবেলায় সেখানে পৌঁছলুম, দুপুরবেলায় মা আমাকে কোলে নিয়ে আর-এক বাড়িতে বেড়াতে গেলেন, সেই বাড়ির বাইরে একটা গাছ দেখেছিলুম, তার পাতাগুলো খুব সরু সরু, মা বললেন, "ঝাউ গাছটা কত বড় হইয়া গেছে।" এই সব টুকরো টুকরো ছবি আর কথা এখনও ভুলিনি।

আবছা-আবছা মনে আছে সেই হলুদ-রঙের-কাপড়-পরা শেয়াল-মারা লোক-গুলোর কথাও, মস্ত মস্ত দুটো কুকুর সঙ্গে নিয়ে যারা মামাবাড়ির পিছন

দিককার মাঠে গিয়ে নেমেছিল। কুকুর দুটোকে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, মাঠের উপরে উপুড় হয়ে, শেয়ালের গলা নকল করে তারা হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া বলে ডাকতে লাগল। পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পেলুম যে, সেই ডাক শুনে একটা শেয়াল হঠাৎ জঙ্গল থেকে মাঠের উপরে বেরিয়ে এসেছে। কুকুর দুটো অমনি তীরের মতন সেদিকে ছুটে গেল। আশ্চর্য, এত সব কথা আমার মনে আছে, অথচ শেয়ালটাকে তারা মারতে পেরেছিল কিনা, তা কিন্তু আমার একদম মনে নেই।

মামাবাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরেই সেবার আমরা দেওঘরে যাই। সেখানকার কথাও ঠিক এই রকমের টুকরো টুকরো ভাবে মনে পড়ে। টুকরো টুকরো কথা আর টুকরো টুকরো ছবি, একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও সম্পর্ক সর্বদা খুঁজে পাই না। আমার মেজো-কাকা আর ছোট-কাকা সেবারে সঙ্গে ছিলেন। দিদি আর ছোট-পিসি তো ছিলই। আমাদের উঠোনে একটা আতা গাছ ছিল, দিদি আর ছোট-পিসি তার তলায় বসে রান্নাবাড়ি খেলত। দিদির একটা মাটির পুতুল ছিল। হুঁকো-হাতে দাড়িওয়ালা বুড়ো। তার মাথায় একটা টোকা মারলেই অনেকক্ষণ ধরে সে ঘাড় নাড়তে থাকত। সেই পুতুলটাকে ইঁদারার উপরে বসিয়ে রেখে দিদি একদিন চান করছিল, সেই সময়ে বালতির ধাক্কা লেগে পুতুলটা হঠাৎ ইঁদারার মধ্যে পড়ে যায়। তাই নিয়ে দিদি খুব কান্নাকাটি করেছিল। সেই দিন কি তার পরের দিন বিকেলবেলায় জল খেতে গিয়ে মা দেখেন যে, জলের মধ্যে সাদা সাদা কী সব ভাসছে। বাবাকে সে-কথা বলতে তিনি দিদির দিকে তাকিয়ে বলেন যে, এ নিশ্চয় সেই বুড়োর দাড়ি।

দেওঘরে থাকতে একদিন হাতির পিঠে চড়েছিলুম। বারান্দা থেকে বাবা আমাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, আর হাতির পিঠ থেকে মাহুত আমাকে লুফে নেয়। ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম।

মাঝ-রাত্তিরে মেজো-কাকা একদিন আমার ঘুম ভাঙিয়ে মোষ-বলি দেখাতে নিয়ে যান। আর-একদিন গিয়েছিলুম ত্রিকূট পাহাড়ে। সেখানে একজন সন্ন্যাসীকে দেখেছিলুম। পাশে একটা ত্রিশূল পোঁতা, চোখ বুজে চুপচাপ তিনি বসে ছিলেন। মা বললেন, ধ্যান করছেন। একটা গুহাও দেখলুম। তার মধ্যে কেউ কথা বললে পাথরে ধাক্কা খেয়ে কথাটা আবার ফিরে আসে, এক কথা দু'বার শোনা যায়। তখন সন্ধে হয়ে আসছিল। মেজো-কাকা বললেন, "কেমন একটা বোঁটকা-মতো গন্ধ পাচ্ছি, এখন নেমে যাওয়াই ভাল।" মা বললেন, "রনো, তোর মতো ভিতু আমি আর একটাও দেখিনি।" ফিরতি-পথে, অন্ধকারের মধ্যে, বাবা একটা গাছের মাথা তাক করে বন্দুক ছুঁড়েছিলেন। তার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে-না-যেতে ধুপ করে একটা শব্দ হয়েছিল। গাছ থেকে কিছু-একটা খসে পড়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু সেটা যে কী, শুকনো-মরা একটা ডাল, না কোনও জন্তু, কাছে গিয়ে তা আর দেখা হয়নি।

দেওঘর সম্পর্কে এ ছাড়া আর কিছু আমার মনে পড়ে না।

হুজুরকে অবশ্য ভুলিনি। তাকে এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। আর মনে পড়লেই আজও আমি শিউরে উঠি।

হুজুরকে ওই দেওঘর থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। দেহাতী, বোকাসোকা লোক, কিছু জিজ্ঞেস করলে ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, আমাদের বাড়িতে আতা বেচতে এসেছিল, তা মা বললেন, "চল্, তোকে কলকাতায় নিয়ে যাই।" শুনে বাবা তো হেসেই অস্থির। হাসেন আর বলেন, "চাকরকে 'হুজুর' বলতে হবে! নাঃ, তুমি একটা কাণ্ডই করলে।"

এই হুজুরের উপরেই বাবা একদিন বিষম রেগে গিয়েছিলেন। বড়-কাকা ভাগ্যিস বুদ্ধি করে তাকে আমাদের পাশের বাড়িতে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা নইলে বোধ হয় হুজুর সেদিন আর আস্ত থাকত না।

মূলে একটা কুকুরের বাচ্চা। দেওঘর থেকে কলকাতায় ফিরবার পর একদিন রাত্তিরবেলা বাবা একটা মস্ত থলে হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। আমরা ভেবেছিলুম, অনেক খাবার-দাবার নিয়ে এসেছেন বুঝি। দিদি বলল, সাহেবদের দোকানের কেক্ না হয়ে যায় না। 'কেক্' যে কী বস্তু, তা আমি জানতুম না, তবে আন্দাজে বুঝে নিলুম যে, নতুন রকমের কোনও খাবার জিনিসই হবে। দিদিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না; তার কারণ, দিদি তখন 'লী মেমোরিয়াল' ইশকুলে পড়ত, আর কথায় কথায় আমাকে বলত 'পাড়াগেঁয়ে ভূত'। তা আমি তো খুব আশায় আশায় আছি যে, এবারে বেশ খাওয়া-দাওয়া হবে, কিন্তু ওমা, কোথায় কী, থলে খুলতেই তার থেকে একটা কুকুর-ছানা বেরিয়ে পড়ল। ল্যাজ নাড়ে, কুঁই কুঁই করে ডাকে, এর-ওর-তার পা চেটে দেয়, মেজো-কাকার গোড়ালিতে বুঝি দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল, তিনি অমনি "বৌদি, আমাকে খেয়েছে" বলে, বিরাট একটা লাফ মেরে, সেই যে সেখান থেকে পালালেন, সে-রাত্রে তাঁর আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। ফুটফুটে বাচ্চা। ধপধপে সাদা রঙ, তার উপরে কালো কালো বুটি, দেখতে যে কী সুন্দর, সে আর কী বলব। তার উপরে আবার দারুণ ছটফটে। এক দণ্ড চুপ করে বসে থাকে না, এই একটা আরসোলা দেখে ছুটে যাচ্ছে, এই গিয়ে মায়ের শাড়ির আঁচলটাকে কামড়ে ধরছে, মাঝে মাঝে আবার নিজেরই ল্যাজটাকে কামড়াবার জন্যে বাঁই বাঁই করে চরকির মতো ঘুরতে থাকে, দেখে তো আমরা হেসে বাঁচি না।

মা বললেন, "এটাকে আবার কোত্থেকে জোটালে?"

বাবা বললেন, "ক্যালকাটা ক্লাবের মায়ার্স সেদিন বলছিল যে, ওর কুকুরের তিনটে বাচ্চা হয়েছে। শুনে আমি বলেছিলুম, আমায় একটা দাও। তা আজ দেখি বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে এসেছে।"

"থলে পেলে কোথায়?"

"ক্লাবের মালীর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম। কেচে শুকিয়ে রেখো, কাল ওটাকে ফেরত দিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে এখন দিন কয়েক দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছু দিও না।"

বড়-কাকা বললেন, "ব্যাটার একটা নাম দেওয়া দরকার।"

দিদি তো সাহেবদের ইশ্কুলে পড়ে, তাই 'জিম' 'জ্যাক' 'টম' এই সব নাম করতে লাগল। শুনে বড়-কাকা হেসে বললেন, "দূর দূর, সাহেব-বাড়ির কুকুর বলে কি কুকুরটাও সাহেব নাকি?"

বড়-কাকা খুব রগুড়ে মানুষ। সক্কলের এমন মজার মজার নাম রাখেন যে, শুনলেই হাসি পেয়ে যায়। রোজ ভোরবেলায় একটা গোলগাল লোক আমাদের গলিতে এসে 'মাখ্খন গোলি মাখ্খন গোলি' বলে হাঁক পেড়ে সক্কলের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। বড়-কাকা তার নাম দিয়েছিলেন 'গণ্ডগোলিয়া'। মিশকালো যে লোকটা আমাদের কয়লা দিয়ে যেত, তার নাম দিয়েছিলেন 'কাগেশ্বর'। আমার দিদির ভাল নাম যূথিকা, ডাকনাম জুঁই। কিন্তু বড়-কাকা তাকে বলতেন 'মিসিবাবা'। আর ছেলেবেলায় আমি তো খুব রোগাপট্কা ছিলুম, তাই আমাকে তিনি 'ভীম ভবানী' বলে ডাকতেন।

কুকুরের বাচ্চাটার নাম দিয়ে দিলেন, "কুট্টুস"।

সেই কুট্টুস একদিন তিনতলার ছাতের থেকে রাস্তায় পড়ে মরল।

আমাদের বাড়ির ঠিক উলটো দিকে ছোট্টু সিংয়ের পানের দোকান। সে-ই প্রথমে কুট্টুসকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। প্রথমে আমরা কিচ্ছু বুঝিনি। পরে যখন সে "কুত্তা গির্ গিয়া...কুত্তা গির্ গিয়া" বলে চেঁচাতে থাকে, তখন আমি আর বড়-কাকা দুদ্দাড় করে একতলায় নেমে, সদর-দরজা খুলে রাস্তায় ছুটে যাই। কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না। কুট্টুসের মুখের কস্ দিয়ে তখন রক্ত গড়াচ্ছে, ছোট্ট শরীরটা বার দুয়েক কেঁপে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেল।

বাবা তখন কলেজে। দিদি আর ছোট-পিসি তখন ইশকুলে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দোতলায় উঠে এলুম আমরা। মা তো কুট্টুসকে দেখে শিউরে উঠলেন। বড়-কাকা বললেন, "ছোট্টু সিং বললে, কুট্টুসকে সে তিনতলার ছাতের থেকে পড়তে দেখেছে। কিন্তু আমাদের ছাতে তো রেলিং নেই, ইঁট দিয়ে গাঁথা পাঁচিল, কুট্টুস তা হলে পড়ল কীভাবে?"

বলেই কী যেন ভাবলেন। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর কোথায়, বৌদি?"

মা বললেন, "একটু আগে কাপড় মেলে দিতে ছাতে গেছে।"

শুনেই বড়-কাকা তেতলার ছাতে গিয়ে হুজুরকে ধরে নিয়ে এলেন। তারপর মাকে বললেন, "এই ব্যাটাই কুট্টুসকে ছাতের থেকে ফেলে দিয়েছে।"

হুজুর অবশ্য অপরাধ অস্বীকার করল না। বড়-কাকাকে তো আগেই বলেছিল, এখন মাকেও বলল যে, হ্যাঁ, সে-ই কুট্টসকে ছাতের থেকে ফেলে দিয়েছে।

দেখলুম, সে হাসছে। সব সময়েই তার মুখে একটা বোকা-বোকা হাসি লেগে থাকে। আজ সেই হাসিটাকে খুব বীভৎস দেখাচ্ছিল। হাসতে হাসতেই সে বলল, "হাঁ, হাম্‌হি ওহি কুত্তাকে মার্ দিয়া।"

শুনে শিউরে উঠে মা বললেন, "কেন মারলি? তোকে কামড়েছিল?"

"নেহি।"

"আঁচড়েছিল?"

"নেহি।"

মা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। "তাহলে তুই ওকে ফেলে দিলি কেন? ও তো তোর কিছু করেনি, তবে কেন ওই দুধের বাচ্চাটাকে তুই মারলি?"

বড়-কাকাও বললেন, "কিঁউ তুম্ খতম কর্ দিয়া উস্‌কো?"

হুজুরের উত্তরটা এখনও আমার কানে লেগে আছে। "হাম্ উসকো খতম্ কর্‌নে মাঙা। ইস্ লিয়ে খতম কর দিয়া।"

মা এতক্ষণ চোখে আঁচল চেপে কাঁদছিলেন। হঠাৎ সেই আঁচল তিনি সরিয়ে নিলেন। তারপর হুজুরের দিকে তাকিয়ে, যেন ভূত দেখছেন এইভাবে চমকে উঠে ভীষণ আর্ত গলায় চেঁচিয়ে বললেন, "চন্দর, এই পাপটাকে তুই এখুনি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা।"

বাবা না-ফেরা পর্যন্ত সে-রাত্রে আমরা কেউ ঘুমোইনি। বাড়ি ফিরে, সমস্ত শুনে বাবা বললেন, "চন্দর, সেই হতচ্ছাড়াটাকে একবার ডেকে আন তো।"

ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মা, আমি, দিদি, ছোট-পিসি, বড়-কাকা, মেজো-কাকা আর ছোট-কাকা। কেউ কোনও কথা বলছি না। আমরা জানি যে, বিকেলবেলাতেই হুজুরকে আমাদের পাশের বাড়িতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মা আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, বাবা যেন ঘুণাক্ষরেও সে-কথা টের না পান। তাই আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

শুধু অস্ফুট গলায় মা বললেন, "কেন, তাকে ডেকে আর কী হবে?"

বাবা বললেন, "তাকে আমি তিনতলার ছাতে নিয়ে গিয়ে রাস্তার উপরে ছুঁড়ে মারব।"

মা বললেন, "কিন্তু সে তো পালিয়েছে।"

বাবার রাগ আমি সেই প্রথম দেখি। টকটকে ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গেছে, চোখে যেন আগুন জ্বলছে, হাতের মুঠো বারবার বন্ধ হচ্ছে আর খুলে যাচ্ছে,— হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে তিনি বসে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বার হচ্ছিল না, শুধু শরীরটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎ কী যে হল, হাউহাউ করে আমি কাঁদতে লাগলুম। দুপুর থেকেই আমার বুকের মধ্যে কিছু-একটা জমে উঠছিল, আমার নিশ্বাস একটু একটু করে আটকে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল, এক ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই। দাঁতে দাঁত চেপে এতক্ষণ তবু দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি। কিন্তু আর সামলে রাখতে পারলুম না নিজেকে; সমস্ত উদ্বেগ, সমস্ত আতঙ্ক আর সমস্ত অভিমান হঠাৎ কান্না হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

মা এসে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, "কী হল তোর? তোকে তো কেউ কিছু বলেনি, তুই তা হলে কাঁদছিস

কেন ?"

আমার কান্না তবু থামল না। তখন ছোট-পিসির দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "দয়া, অমুকে একটু অন্য কোথাও নিয়ে শান্ত কর তো।" তারপর অন্যদেরও বললেন, "যা, তোরাও আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না।"

হুজুরকে তার পরের দিন এক ফাঁকে হাওড়া ইস্টিশানে নিয়ে দেওঘরের গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমি সে-কথা পরে শুনেছি, তার কারণ সেই রাত্রেই আমার কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ডাক্তারবাবু বাবার বন্ধু। সকালবেলায় তিনি এসে জ্বর-কাঠিতে আমার জ্বর নিলেন, জিভ আর চোখের পাতা টেনে দেখলেন, তারপর বললেন, "হঠাৎ কোনও ব্যাপারে ভয়-টয় পেয়েছিল ?"

মা বললেন, "তা পেয়েছিল। আপনার বন্ধু কাল রাত্রে খুব রেগে গিয়েছিলেন। আর জানেনই তো, এমনিতে একেবারে মাটির মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে ওঁর আর কোনও জ্ঞানই থাকে না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তাই বলি, আচমকা এমন জ্বর উঠে গেল কেন। তা চিন্তার কিছু নেই। একটা মিকশ্চার লিখে দিচ্ছি, দিনে তিনবার খাওয়াবেন, কাল সকালের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে যাবে।"

জ্বর কিন্তু সহজে গেল না। তখনকার মতো সেরে উঠলুম বটে, কিন্তু ঘুরে-ঘুরে আবার জ্বর হতে লাগল। সন্ধে হলেই কাঁপিয়ে জ্বর আসে, চোখ জ্বালা করে, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। রাস্তার মোড়ে করিম বক্সের পাঁউরুটির দোকান, সেখানে লাল টিপ-দেওয়া, পদ্মকাটা বিস্কুট পাওয়া যায়, ছোট-পিসি সেই বিস্কুট এনে দিয়েছিল, কিন্তু তাও কেমন যেন তেতো লাগল। ঘুমও ভাল করে হয় না; খালি মাথা ঘোরে, আর মনে হয় যেন খাটের থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। তারপর সকাল হলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। কিন্তু তখন আরও দুর্বল লাগে।

রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, "কলকাতায় এসে ম্যালেরিয়া বাধিয়েছে দেখছি।"

তার পরের মাসেই বাবা আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

॥ ৯ ॥

রোজই এখন একটু-একটু করে জল বাড়ছে। পরশু বিকেলে খেলার মাঠে গিয়ে দেখি, মাঠের আদ্ধেকটাই জলের তলায়। কাল সকালে দেখলুম, পুকুরের পাশের পাট-খেতের মধ্যেও জল ঢুকেছে। তাই দেখে জাগীর-দাদাকে নিয়ে পুকুরের পুব-পাড়ে একটা জুলি কেটে দিলুম; খেতের জল তখন কলকল করে সেই জুলির ভিতর দিয়ে পুকুরে এসে ঢুকতে লাগল। জুলির মধ্যে জাগীর-দাদা একটা 'চাওড়া' বসিয়ে দিল। 'চাওড়া' মানে মাছ ধরবার খাঁচা। তার দরজাটা এমন কায়দা করে বানানো যে, সেই দরজা দিয়ে ঢোকা যায়, কিন্তু ঢুকলে আর বার হওয়া যায় না। মাছগুলো তো সব সময়ে স্রোতের উল্টো দিকে এগোয়। জাগীর-দাদা বলেছিল, পুকুরের মাছও উল্টো দিকে এগোতে গিয়ে ওই খাঁচার মধ্যে ধরা পড়বে। তা আজ ভোরবেলায় পুকুরের ধারে ছুটে গিয়ে দেখি, আরেব্বাস্, মাছ কোথায়, মস্ত একটা গোখরা সাপ তার মধ্যে বসে ফনা দোলাচ্ছে। আমার সঙ্গে ছিল রব্বান। গোরু তাড়াবার পাচনবাড়ি দিয়ে সাপটাকে সে পিটিয়ে মারল, তারপর লোহার আল-সুদ্ধু সেই পাচনবাড়িটা তার পেটের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে "শালা, তুমি চুরি কইরা মাছ খাইয়া অহন আবার ম্যাজাজ দ্যাহাও" বলে পাট-খেতের মধ্যে কোথায় যে সেটাকে ছুঁড়ে মারল, তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

প্রায় সারাদিনই এখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে। টিনের চাল গড়িয়ে বারান্দার সামনে যেখানে জল পড়ে, উঠোনের সেই জায়গাটা গর্ত হয়ে গেছে। অন্য সময়ে বড়-কাকীমা তো তাল-তাল কাদার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে তাই দিয়ে লেপেপুঁছে ঘরের ডোয়াগুলোকে একেবারে তক্‌তকে করে রাখেন, এখন সেই ডোয়ার অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়, জল গড়িয়ে গড়িয়ে নানান জায়গায় ধসে গেছে, বৃষ্টি-বাদলা না কাটলে আর এ-সব মেরামত হবে না।

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। ঠাকুমা বলেন, "আকাশডা য্যান্ গা ছাইড়া দিয়া বিষ্টি নামাইতেছে।" মাঝেমধ্যে আবার এমন ঝেঁপে বৃষ্টি আসে যে, দক্ষিণ দিকের মাঠের ওদিককার গ্রামগুলো সব ঝাপসা হয়ে যায়। অন্য সময়ে সেই সব গ্রামের গাছপালা বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাই; কিন্তু তখন আর কিচ্ছু চোখে পড়ে না। মনে হয়, আকাশ থেকে একটা ধপধপে সাদা চাদর ঝুলিয়ে সবকিছুকে হঠাৎ আড়াল করে দেওয়া হয়েছে।

মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে এক-এক সময়ে রোদ্দুর ওঠে। কিন্তু বাতাসের দাপট তবু কমে না। ঠাকুমা বলেন, জল-বলা বাতাস। এই ঠাণ্ডা, জোলো বাতাসই

নাকি নদী, খাল, বিল আর হাওরের জলকে ঠেলে এনে মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

এখন আর হাটেও যেতে পারি না। মাঠ এখনও পুরোপুরি তলিয়ে যায়নি, তবে নাবাল জমিগুলোতে এখনই হাঁটুজল দাঁড়িয়ে গেছে। সাপও খুব বেড়েছে। ঠাকুর্দা বলছিলেন, "বাড়বেই তো, গর্তগুলো সব জলে ভেসে গেছে, ব্যাটারা যাবে কোথায়।" আলের উপরে সেদিন একটা পেটমোটা সাপকে শুয়ে থাকতে দেখলুম। ঢোঁড়া সাপ। যুধিষ্ঠির-দাদা তার লাঠি দিয়ে একটা খোঁচা মারল, তবু নড়ে না। জব্বার বলল, "ব্যাঙ্ খাইয়া খাইয়া প্যাট এক্কেরে জয়ঢাক হইয়া আছে, নড়ন-চড়নের সাইধ্য নাই।"

তার উপরে আবার কাদাও ভীষণ। সেই কাদার উপরে খুদে-খুদে ব্যাঙের বাচ্চারা পোকা-মাকড়ের মতো লাফ মেরে মেরে ঘুরে বেড়ায়। মধ্যের বাড়ির রাঙা-জ্যাঠামশাই বলেন, "এই না-নৌকা না-তর সময়ডাই সব থিকা খারাপ। মাইনষেরে এক্কেরে ঘরের মইধ্যে আটক কইরা রাখে। মাঠ দিয়া যতক্ষণ না নৌকা চলতাছে, ততক্ষণ আর হাটে-বাজারে যাওনের উপায় নাই।"

এর মধ্যে আবার ফুটবলটাও ফেঁসে গেছে। আগের বারে যখন ব্লাডারটাকে সারিয়ে দেয়, মানিক-দাদা তখনই বলে দিয়েছিল, খবর্দার, খেজুর-গাছের কাছে কখনো খেলবি না। কিন্তু খেলার মাঠ তো তলিয়ে গেছে, তা হলে খেলি কোথায়। একে তো উঠোনে ভীষণ কাদা, তার উপরে আবার বাড়ির মধ্যে খেলতে গেলে বেড়ার গায়ে ধাঁই-ধাঁই করে বল লাগে; সেদিন তো একেবারে ঠাকুর্দার কান ঘেঁষে বল বেরিয়ে গেল, বড়ঘরের বারান্দায় বসে তিনি কী একটা বই পড়ছিলেন, সেটাকে নামিয়ে রেখে বললেন, "ওহে অমলাংশুবাবু, তোমার বাবা শুনেছি গড়ের মাঠে কোন্ এক সাহেবের ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিলেন, তা তুমি কি এখন সাহেব না পেয়ে এই কালো আদমীর মাথা ভাঙতে চাও?" তাই কী আর করি, দক্ষিণের ভিটেয় গিয়ে পেটাপিটি করছিলুম। মেঘু, নেউল আর খালেককে অবশ্য বার বার বলে দিয়েছিলুম যে খেজুরগাছের দিকে যেন 'শট' না মারে। তা নেউলটা এমন বোকা যে, ঠিক সেই দিকেই একটা 'শট' মেরে বসল। আর সেলাইয়ের ফাঁকে কাঁটা বিঁধে গিয়ে ফুটবলও অমনি ফটাস্।

এখন আবার ব্লাডারটাকে নিয়ে মানিক-দাদার কাছে যেতে হবে। কিন্তু কী করে যাই? যেতে আমাদের একদম ইচ্ছে করে না। মানিক-দাদার মেজাজ এখন ভীষণ তিরিক্ষে। আগে তো আমাদের কত ভালবাসত। এখন যেন কথাও বলতে চায় না। তার উপরে আবার বাড়িতেই বা থাকে কোথায়, সারাক্ষণ তো শুধু মহাদেবদার বারান্দায় বসে আড্ডা মারে। মহাদেবদা ইদানীং আবার খুব রোগা হয়ে গেছে, সেই আগের মতো খালি খকর-খকর করে কাসে। দূর থেকে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু কাছে যাই না। যমুনা-দিদি নিখোঁজ হবার পর থেকেই আমরা মল্লিক-বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। মহাদেবদার নতুন বউ অবশ্য একদিন আমাদের ডেকেছিল। কিন্তু আমরা যাইনি। মুখ ফিরিয়ে

চলে এসেছিলুম। তার পরে আর ও-বাড়িতে যাওয়া চলে না।

পুবের ঘরে একটা তক্তাপোষে শুয়ে এই সব কথাই আমি ভাবছিলুম। এমন সময় আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এল। খেলাধুলো করবার উপায় নেই, ছুটোছুটি করবার উপায় নেই, শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি—এই সব সময়ে আমার থেকে-থেকে কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়।

এখনও বিকেল হয়নি। বাবা এখন কলেজে। ছোট-পিসি আর দিদি এখন ইশকুলে। মা এখুনি ঘুম থেকে উঠে বিকেলের জলখাবার বানাতে বসবেন। দুপুর-বেলায় মা একটু ঘুমিয়ে নেন। আমি যখন কলকাতায় ছিলুম, তখন আমাকেও এই সময়ে ঠেসে ধরে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমার ঘুম আসত না। চুপচাপ একসময়ে বিছানা থেকে নেমে, পা টিপে-টিপে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতুম। ফিরিওয়ালাদের ডাক শুনতুম। দুপুরবেলায় কোন্ ফিরিওয়ালা কখন আসবে, ডাক শুনে শুনে সব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে আসবে ঝাঁকা-মাথায় একটা কালো, রোগামতো লোক। গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ, ঠিক ঝাঁটার কাঠির মতো। তাকে দেখতে পাবার আগেই দূর থেকে তার গলা শোনা যাবে : ভে—টকি মাছের কাঁটাচা—ই। তার খানিক বাদে আসবে বাসনওয়ালা। ঝাঁকামুটের মাথায় বাসন-কোসনের পাহাড় চাপিয়ে সে একটা কাঁসার থালা বাজাতে বাজাতে বলে যাবে : বি—ষ্টুপুরী খা—গড়াই বা—সন বিক্‌কিরি। তারও কিছুক্ষণ পরে, কাঁধে কোড়া কাপড়ের বানডিল, হাতে একটা চকচকে লোহার লাঠি, 'মোটালা মারকিন...রুপেয়ামে পাঁচ গজ' বলতে বলতে নাগরা-পায়ে একটা লোক আমাদের গলি দিয়ে চলে যাবে। তারপর, বিকেল হবার একটু আগে আসবে 'বুড়ীর মাথার পাকা চুল'। তারপর পাঙ্খা-বরফ : কাঠের চাকা-লাগানো একটা গাড়িকে ঠেলতে ঠেলতে বরফ-ওয়ালা আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ির উপরে একদিকে চৌকো-চৌকো গর্ত, তার মধ্যে থাকে লাল, সবুজ আর হলুদ রঙের সিরাপের বোতল। অন্যদিকে একটা চিৎ-করা র‍্যাঁদা। তলার দিকে একটা পেতলের বাটি ধরে র‍্যাঁদার উপরে একখণ্ড বরফ ঘষলেই সেই বাটির মধ্যে ঝুরঝুর করে বরফের গুঁড়ো পড়তে থাকে। তখন তার মধ্যে একটা কাঠি গুঁজে দিয়ে আর একটু সিরাপ ঢেলে লোকটা তাতে একটা থাপ্পড় মারলেই অমনি পাঙ্খা-বরফ তৈরী হয়ে গেল। মাঝে-মাঝে আবার এই দুপুরবেলাতেই একটা পাগলা-মতন লোক আমাদের গলিতে এসে ঢোকে। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, পরনে একটা ছেঁড়া ঢলঢলে হাফপ্যান্ট, চোখ দুটো জবা-ফুলের মতো লাল, হাতে একটা বেঁটে ছড়ি। সেই ছড়ি দিয়ে সে নিজেরই পিঠ শপাশপ মারতে থাকে, আর এর-ওর-তার কোঁচা চেপে ধরে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে : হাবু—হাবু—পাগলা হাবু!

কলকাতার তালতলা-পাড়ায় আমাদের বাড়ি। একটু এগোলেই ট্রাম-রাস্তা। বাড়ির পিছন দিকে একটা উঠোন আছে, সেই উঠোনের এক কোণে একটা বিলিতী ডুমুরের গাছ আছে, কিন্তু তার ফল কখনও খেয়ে দেখা হয়নি।

দোতলার ঘর দুটোর একটায় থাকতুম আমি, বাবা আর মা; আর অন্যটায় থাকত ছোট-পিসি আর দিদি। কাকারা একতলায় থাকতেন। বাড়ির সিঁড়িটা আমার খুব পছন্দ ছিল। কাঠের সিঁড়ি, ধাপগুলোর ধারে ধারে পেতলের পাত বসানো, উঠতে-নামতে ধুপ্-ধুপ্ করে শব্দ হতো। রেলিংটা ছিল ঘোরানো আর পালিশ-করা। দোতলায় সেই রেলিংয়ের উপরে ঘোড়ার মতো চেপে বসে সড়াক্ করে আমি একতলায় নেমে আসতুম, তাই দেখে ছোটকাকা একদিন খুব বকুনি দিয়েছিলেন।

কলকাতায় ওই একটা মুশকিল। বড্ড বকুনি খেতে হয়। এখানে এই যে পুকুরে এত ঝাঁপাঝাঁপি করি, কেউ কিচ্ছু বলে না। কিন্তু কলকাতায় একদিন চৌবাচ্চায় নামতেই ছোটকাকা এসে চোখ পাকিয়ে বলল, "এই বাঁদর, কী হচ্ছে?" বাবা যে লাল-শিষের মোটা পেনসিল দিয়ে পরীক্ষার খাতায় নম্বর বসান, সেইটে দিয়ে একদিন দেয়ালে একটা রাক্ষসের মুখ আঁকছিলুম, অমনি দিদি এসে ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, "মা, এই জংলী ভূতটাকে দেশে পাঠিয়ে দাও তো।" রাত্তিরবেলায় এই নিয়ে আবার বাবার কাছে নালিশও করা হল। ভেবেছিলুম, বাবাও খুব বকুনি দেবেন। বাবা কিন্তু একদম বকলেন না। দেয়ালের ছবিটা দেখে হেসে বললেন, "বাঃ, বেশ রাক্ষসের মতোই দেখাচ্ছে বটে। দাঁড়া, আজ তোকে এক রাক্ষস-মারা বীরের গল্প বলব।"

সেই রাত্রে তিনি আমাকে পার্সিয়ুসের গল্প বলেছিলেন।

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ কে যেন 'অমু অমু' বলে ধাক্কা মেরে আমাকে জাগিয়ে দিল। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখি কাজল-দিদি। সকালবেলায় তো কাজল-দিদি কখনও আমাদের বাড়িতে আসে না। আজ এসেছে কেন, জিজ্ঞেস করতে কাজল-দিদি হেসে বলল, "দূর বোকা, অখন কি বিয়ান-বেলা নাকি, অখন তো বিকাল। এক ঘুমেই দুপুরডা এক্কেরে পার কইরা দিছিস।"

বড়-কাকীমা ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে আমাকে খেতে ডাকছিলেন। চোখমুখ ধুয়ে, তাল-পাটালি দিয়ে দুধ-মুড়ি খেয়ে, বড়-কাকীমার আঁচলে মুখ মুছে ফের পুবের ঘরে ছুটে এলুম। বৃষ্টি থেমেছে, আর এখন সময় নষ্ট করা চলে না, ছিপটা নিয়ে মেঘুর সঙ্গে এখন ঘাটলায় গিয়ে বসব, এই ভেবে যেই বেড়ার গা থেকে ছিপটা নামিয়েছি, কাজল-দিদি অমনি আমার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "অমু ভাই, অখন আর মাছ মারতে যাইস না, আমার সঙ্গে এট্টু মজুমদার-বাড়িতে চল্, টিউকল থিকা আমারে জল নিতে হবে, তারপর তুই আমারে বাড়ি পর্যন্ত আউগাইয়া দিবি।"

কাজল-দিদি আমাকে খুব ভালবাসে তো, তা ছাড়া ওদের বাড়িতে একটা আঁশফলের গাছ আছে তো, তাই আর আমি 'না' বলতে পারলুম না, ছিপটাকে আবার বেড়ার গায়ে লটকে রেখে বললুম, "চলো।"

কাজল-দিদি কলসিটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি টিউকলের হাতল ধরে

ঝুলছি, এমন সময় মজুমদার-বাড়ির জ্যাঠাইমা তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ও কাজল, এক্কেরে সইন্ধা লাগাইয়া জল নিতে আইছিস, অখন তরে বাড়ি পৌঁছাইয়া দেবে কেডা?"

মুখ তুলে কাজল-দিদি বলল, "সেই জন্যেই তো অমুরে নিয়া আইছি জেঠিমা।"

শুনে জ্যাঠাইমা একগাল হেসে বললেন, "হ, অমু তো এট্টা মস্ত বীরপুরুষ।"

জলের কলসি ইতিমধ্যে ভরে গিয়েছিল। সেটাকে কাঁখে তুলে কাজল-দিদি বলল, "যাই জেঠিমা।"

বারান্দা থেকেই জ্যাঠাইমা বললেন, "যাওন নাই, বোকা মাইয়া, কইতে হয় 'আসি'। আর শোন্, তর মায়রে তো অনেক দিন দেখি নাই, কাইল একবার আইতে কইস।"

মজুমদারদের ভিতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, কাছারি-ঘরের বারান্দায় বসে কালাদা খুব মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে।

কাজল-দিদি তাই দেখে মুখ টিপে হেসে আমাকে বলল, "অমু, তর কালাদারে গিয়া এট্টা কথা জিজ্ঞাস করতে পারবি?"

"কী কথা?"

"গিয়া জিগা যে, এই সইন্ধাবেলায় কোনও মাইয়ার কি একলা-একলা নিস্তার-বাগ পার হইয়া বাড়ি যাওন উচিত?"

কিন্তু কালাদাকে আর তা জিজ্ঞেস করতে হল না। বারান্দা থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল তো, বইখানাকে সরিয়ে রেখে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর, কাজল-দিদিকে যেন দেখতেই পায়নি, এইভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই ভর-সইন্ধায় আবার কোথায় চললি অমু?"

"কাজল-দিদিরে এট্টু আউগাইয়া দিয়া আসি।"

"তারপর তরে আবার এই পর্যন্ত আউগাইয়া দেবেনে কেডা? একলা-একলা নিস্তার-বাগ পার হইয়া আবার আসতে পারবি তো?"

শুনেই আমার ভয়-ভয় করতে লাগল। বললুম, "তুমিও আমাগো সঙ্গে চলো কালাদা।"

তাই শুনে কালাদা বলল, "আমিই যদি যাই, তয় আর তর যাওনের কাম কী?"

কাজল-দিদি এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। শুধু মুখ টিপে-টিপে হাসছিল। এইবারে বলল, "না, অমুও চলুক।"

মজুমদার-বাড়ি থেকে একটু এগোলেই পাঠশালার দো-চালা ঘর। এখন আর পাঠশালা বসে না। পাঠশালা-ঘরে পণ্ডিতমশাই একটা মুদীর দোকান খুলেছেন। তারপর মল্লিক-বাড়ি। রাংচিতের বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলুম, মানিক-দাদা আর মহাদেবদা বারান্দায় বসে আছে। কালাদা বলল, "মাইন্কাদা তো আইজকাল দেখি মল্লিক-বাড়ির থিকা আর নড়তেই চায় না।"

কাজল-দিদি কোনও কথা বলল না। আমার হঠাৎ যমুনা-দিদির কথা মনে পড়ল। এই সেদিনও যমুনা-দিদিকে ওই বারান্দায় বসে মাখন টানতে দেখেছি। আমাদের দেখতে পেলেই ডেকে পাঠাত, আমসত্ত্ব দিত। এখন আর কাউকে তার কথা বলতে শুনি না। ঠাকুমাকে সেদিন যমুনা-দিদির কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। তা তিনি বললেন, "আয়, তরে আজ সেই সাত-গুটি বাঘবন্দীর খেলাটা শিখাইয়া দেই।" এই একটা মজার ব্যাপার দেখছি। যমুনা-দিদির কথা উঠলেই অমনি ঝট্ করে সবাই অন্য কথার মধ্যে চলে যায়।

সারাটা দিন বৃষ্টি গেছে। সকাল থেকে বিকেল অব্দি একবারও রোদ্দুর ওঠেনি। এখন বড়-পুকুরের পাড় দিয়ে নিস্তার-বাগের দিকে এগোতে-এগোতে চোখে পড়ল, পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডুবছে। ডগ্ডগে লাল রঙ, সূর্যকে এই সময়ে আলতা-মাখা মস্ত একটা থালার মতো দেখায়। পুকুরের ধারে সারি-সারি হিজল গাছ। তলাটা সারাক্ষণ স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। বিকেলবেলাতেই বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু হিজলের পাতা আর ফুল থেকে তখনও ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছিল।

নিস্তার-বাগে ঢুকবার মুখে কাজল-দিদি একবার থেমে দাঁড়াল। তারপর কালাদার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার পায়ে পড়ি কালাদা, আইজ আর কোনও দুষ্টামি কইরো না।"

কালাদা একটা ছিট্কির ডাল ভেঙে নিয়ে তাই দিয়ে তার ডাইনে-বাঁয়ে গাছ-পালাগুলোকে শপাশপ মারতে মারতে এগোচ্ছিল। কাজল-দিদির দিকে সে একবার তাকাল না পর্যন্ত। অন্য দিকে চোখ রেখে বলল, "দুষ্টামি করবার কোনও জো-ই তো তুমি রাখো নাই।"

কাজল-দিদি তাতে বলল, "ওঃ, বাবুর দেখি ভীষণ রাগ!"

আমি কিছু বলছিলুম না। নিস্তার-বাগ এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। দু' দিকে মস্ত মস্ত গাছ। তার ডালপালা দুপুরবেলাতেও রোদ্দুরকে আড়াল করে রাখে, আর এখন তো সন্ধে হয়ে গেছে। বড়-পুকুরের ওদিক থেকে গুব্-গুব্-গুব্-গুব্ করে একটানা একটা শব্দ ভেসে আসছিল। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। দু' পাশে, বড়-বড় গাছের তলায়, আশ-শ্যাওড়া আর বেতের ঝোপ। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পথ ফুরোলেই বাঁশের চার্, অর্থাৎ সাঁকো। সাঁকো পেরোলেই বড় মিত্তির-বাড়ি। ভাবছিলুম যে, কাজল-দিদিকে ও-পারে পৌঁছে দিয়ে চটপট এখন বাড়িতে ফিরতে পারলে বাঁচা যায়।

তার মধ্যে আবার কালাদা বলল, "অমু, তর সাহস কত দেখি, আমরা যদি এইখানে এট্টু দাঁড়াই তো তুই একলা-একলা চার্ পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরা আসতে পারবি?"

কাজল-দিদি বলল, "এই আবার তোমার দুষ্টামি আরম্ভ হইল। না রে অমু, তর একলা যাওনের কাম নাই।"

যেতে আমারও একদম ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু না-গেলে নিশ্চয় কালাদা

আমাকে ভীষণ ভিতু ভাববে, চাই কী, মেঘু আর নেউলকেও হয়ত বলে দেবে, তা ছাড়া সাঁকোর কাছে তো প্রায় পৌঁছেই গেছি, এক ছুটে গিয়ে আবার ফিরে আসতে কতক্ষণই বা লাগবে, এই ভেবে বললুম, "তোমরা কিন্তু কোথাও যাইও না।"

তাতে কালাদা বলল, "নাঃ, আমরা এইখানেই আছি।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুট লাগালুম। ফিরতি পথে—সেই আবছায়া অন্ধকারের মধ্যেই—চোখে পড়েছিল যে, জলের কলসিটা পথের উপরে নামানো, আর পথের পাশে, কাজল-দিদিকে জড়িয়ে ধরে, কালাদা দাঁড়িয়ে আছে। কাজল-দিদি ছটফট করছিল। কালাদা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিছু-একটা বলতে চাইছিল বোধহয়, কিন্তু কাজল-দিদি বার বার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, কালাদার কথাটা সে শুনতে চাইছিল না। আমাকে দেখবামাত্র কালাদাকে একটা ধাক্কা মেরে কাজল-দিদি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম, "কী, আমার সাহস দ্যাখলা তো?"

কালাদা সে-কথার কোনও উত্তর দিল না। কাজল-দিদি তার কলসিটা আবার তুলে নিল। তারপর সাঁকোর কাছে গিয়ে কালাদাকে বলল, "থাক্, তোমার আর ও-পারে যাওনের দরকার নাই। খুব বীরত্ব দেখাইছ, অখন এইখানে এট্টু দাঁড়াও, অমু গিয়া আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুক।"

ও-পারে পৌঁছে কাজল-দিদি বলল, "অমু ভাই, মা কিছু জিজ্ঞাস করলে কইস যে, তুই একলাই আমার সঙ্গে আইছিস। কেমন?"

বড় মিত্তির-বাড়ির জ্যাঠাইমা তাঁদের বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাজল-দিদিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ফিরতে এত দেরি হইল ক্যান্ রে?"

"মজুমদার-বাড়ির জেঠিমা এতক্ষণ আটকাইয়া রাখছিলেন। এতবার কইলাম যে, জেঠিমা, আইজ যাই, দেরি হইলে মায় রাগ করবে, তা তাঁর গল্প আর ফুরাইতেই চায় না।"

বড়রা যে এত মিথ্যে কথা বলে কেন, বুঝি না।

সাঁকোর এ-পারে কালাদা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল, "মিত্তির-বাড়ির পিসিমারে দেখলি?"

"হ, উঠানে আইসা খড়াইয়া ছিল।"

"তোর কাজল-দিদিরে বকাবকি করে নাই তো?"

"না।"

সারা পথ আর কোনও কথা হল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগলুম আমরা। নিস্তার-বাগ থেকে বেরিয়ে এসে, হিজলগাছের তলা দিয়ে, মল্লিক-বাড়ির উঠোনের পাশের উঁচু রাস্তায় এসে উঠলুম। রাংচিতের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, মহাদেবদার বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বলছে, আর সেই লণ্ঠনের একটু দূরে বসে মানিক-দাদা আর মহাদেবদার নতুন বউ খুব গল্প করছে। দুজনেই খুব হাসছিল। মহাদেবদাকে কিন্তু দেখতে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে শুনলুম, জলকাদা ভেঙে ভরত-কাকা আজ রসুলপুরের হাটে গিয়েছিল। আমাদের চিঠি-পত্তর তো সব হাটের দিনে বিলি হয়, তা ভরত-কাকা নাকি সেখান থেকে কলকাতার চিঠি নিয়ে এসেছে।

ঠাকুমা বললেন, "তোর বাবা লিখছে। পূজার দিনকয় আগেই সক্কলরে নিয়া দ্যাশে আসবে। তা পূজা তো প্রায় আইসাই গেল। আর দুই মাসও বাকী নাই।"

॥ ১০ ॥

ঠাকুর্দা তাঁর খাটের উপরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। জাগীর-দাদা তামাক সেজে আনল। মা তার হাত থেকে কলকেটা নিয়ে গড়গড়ায় বসিয়ে ফর্সিটা নিয়ে ঠাকুর্দার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর খাটের পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে বসলেন তিনি। ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানলেন, তারপর ফর্সিটাকে মুখের থেকে নামিয়ে বললেন, "না বউমা, তোমাদের আর-একটু হিসেবী হয়ে চলা উচিত।"

দুটো খাট জোড়া লাগিয়ে এদিকে মস্ত বড় বিছানা পাতা হয়েছে। তার উপরে, ঠাকুমার চার পাশে, গোল হয়ে বসে আছি আমরা। আমি, বড়-কাকীমা, দিদি, ছোট-পিসি আর মেজো-কাকা। বড়-কাকীমা এতদিন ঠাকুমার কাছেই শুচ্ছিলেন। আজ থেকে অন্য ঘরে চলে যাবেন। ঠাকুমার এক-পাশে আজ আমি শোব; অন্য পাশে দিদি আর ছোট-পিসি।

আমরা ছোটরা অনেক আগে খেয়ে নিয়েছি। বড়দের এখনও খাওয়া হয়নি। বড়-কাকা আর ছোট-কাকা পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলেন। একটু আগে ফিরে এখন কাছারি-ঘরে গিয়ে বসেছেন।

কাছারি-ঘরের ওদিক থেকে টুকরো-টুকরো কথা ভেসে আসছিল। মাঝে-মাঝে চিৎকার উঠছিল 'কচ্ছয় বারো'। বাবা তো খুব শব্দ করে হাসেন। মাঝে-মাঝে সেই দমকা হাসির শব্দও শুনতে পাচ্ছিলুম আমরা। কাছারি-ঘরে পাশার আড্ডা বসেছে। এর মধ্যে আমি পাঁচ-ছ'বার গিয়ে পান দিয়ে এলুম। মা আর বড়-কাকীমা পুরো এক বাটা পান সেজে রেখেছেন। মাঝে-মাঝে বাবা বলে পাঠাচ্ছেন, "পান পাঠাও।" আর আমি গিয়ে ডিবে-ভর্তি পান দিয়ে আসছি। বাবা খুব পান খান। এক-একবারে তিনটে-চারটে খিলি নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দেন। কিন্তু চা-ও খান না, তামাকও খান না।

ঠাকুর্দা কিন্তু খানিক বাদে-বাদেই তামাক খান। কলকাতা থেকে বাবা তাঁর জন্যে অম্বুরী তামাক নিয়ে এসেছেন। তার গন্ধে সারা ঘর ম-ম করছে। বাড়িতে এখন একটুও অন্ধকার নেই। দু-দুটো হ্যাজাগ বাতি জ্বলছে। একটা এ-ঘরের বারান্দায়, আর-একটা কাছারি-ঘরে। বিকেল থেকেই সেখানে জোর আড্ডা বসে গেছে। অন্য দিন তো এর কত আগেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। এখন কিন্তু কারও ঘুমের নাম নেই। কাল রাত্তির থেকেই আমাদের বাড়ির চেহারা এক্কেবারে অন্যরকম।

আমার মাকে তো ঠাকুর্দা খুব ভালবাসেন; বলেন, "বড়-বউমা আসবার পর

থেকেই আমার সংসার একটু একটু করে ভরে উঠেছে।" এখন তাঁকে কাছে বসিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তিনি কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বাসা কেমন হয়েছে, ভাড়া কত, সব ঘরে আলো-হাওয়া ঢোকে কিনা, বাবার কলেজ থেকে কত দূরে, বাজার কে করে, সংসার-খরচা কত লাগে, এই সব হাজার প্রশ্ন। কথায় কথায় মা বলছিলেন যে, কলকাতার বাড়ির খরচা ভীষণ বেড়ে গেছে, তিনি আর কুলিয়ে উঠতে পারছেন না।

শুনে ঠাকুর্দা বললেন, "ইন্দ্র যা মাইনে পায়, তাতে তো না-কুলোবার কথা নয়; না বউমা, তোমাদের আর-একটু হিসেবী হয়ে চলা উচিত।"

মা বললেন, "আমার কোনও দোষ নাই, বাবা, আমি তো হিসাবী হইয়া চলারই চেষ্টা করি, কিন্তু মাসের কুড়ি-বাইশ তারিখ পার হইতে-না-হইতেই দেখি, হাতে আর পয়সা নাই।"

"কিন্তু মাইনে পেয়ে ইন্দ্র তো সব টাকা তোমার হাতেই তুলে দেয়?"

"তা দেন। কিন্তু তারপরেই আইজ আইসা কন্ যে, অমুকের বাড়িতে খুব অসুখ, পঞ্চাশ টাকা ধার চাইছে—কাইল আইসা কন্ যে, তমুকের মাইয়ার বিয়া গেল, তাই এই মাসে তার খুব টানাটানি, অন্তত চল্লিশটা টাকা তারে ধার না-দিয়া উপায় নাই। সারা মাস এই রকম লাইগাই আছে। আর মজা এই যে, উনি তো সক্কলরেই বিশ্বাস কইরা টাকা দেন, কিন্তু সেই টাকা আর কেউ কোনদিন ফেরত দেবার নামও করে না।"

ঠাকুর্দা বললেন, "না না, মানুষের উপকার করা ভাল, একে অন্যের দরকারের সময় সাহায্য করবে বই কী, কিন্তু তাই বলে এমন বেহিসেবী হওয়া তো ঠিক নয়। বলো তো আমি না-হয় ইন্দ্রকে ডেকে একটু সাবধান করে দিই।"

মা বললেন, "তাইলে তো খুব ভালই হয়।"

ঠাকুর্দা বললেন, "ওহে অমলাংশুবাবু, কাছারি-ঘর থেকে তোমার বাবাকে একবার ডেকে আনো তো।"

অন্য দিন এই সময়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেও গা-ছমছম করে, কিন্তু আজ তো সারা বাড়ি আলোয় আলো, তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে, বাইরের উঠোন পার হয়ে আমি কাছারি-ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। বাবা তখন দান দেবার আগে, দু-হাত জোড় করে, পাশা তিনটেকে তার মধ্যে কড়কড় করে ঘষছেন, আমাকে দেখে বললেন, "কী রে, ব্যাপার কী?"

"দাদু তোমারে ডাইকা পাঠাইছেন।"

"সে কী, বাবা এখনও ঘুমান নাই?"

"না।"

"তাঁর খাওয়া হইছে তো?"

"না, তোমার জইন্যে বইসা আছেন।"

আর-কিছু বলতে হল না। বাবা তখুনি ফরাস ছেড়ে উঠে পড়লেন। অন্যদের বললেন, "আইজকার মতন তাইলে থাক্।"

বাবা এসে ঘরে ঢুকতেই মা আর কাকীমা ঘোমটা টেনে অন্য ঘরে চলে গেলেন। ঠাকুর্দা তাঁর খাটের পাশের টুলটা দেখিয়ে বাবাকে বললেন, "বোসো।" তারপর ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বউমাদের ঠাঁই করতে বলে দাও। এক-সঙ্গে ঠাঁই করুক, অনেক দিন তো ছেলেদের সঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি, আজ সবাই এক জায়গায় বসে খাওয়া যাবে।"

দেশের বাড়িতে এলেই সকলের কথার টান পালটে যায়। বাবা কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব সতর্ক। ঠাকুর্দার সামনে তিনি কখনও বাঙাল-টানে কথা বলেন না। মুখ নিচু করে বললেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না, তা আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন।"

ঠাকুর্দা সে-কথার জবাব না-দিয়ে বললেন, "তোমাদের কলকাতার বাড়ি নিয়ে কথা হচ্ছিল। তা শুনলুম যে, তুমি নাকি যখন-তখন যাকে-তাকে টাকা ধার দাও, আর সেই টাকা নাকি কক্ষনো ফেরত পাওয়া যায় না। কথাটা তো ভাল নয়।"

বাবা বললেন, "এ-কথা আবার কে বলল? আপনার বউমা বুঝি?"

ঠাকুর্দা বললেন, "যে-ই বলুক, কথাটা কি ঠিক?"

আমতা-আমতা করে বাবা বললেন, "না, মানে ঠিক যাকে-তাকে তো দিই না, বন্ধু-বান্ধবরা এসে ধার চায়, না দিয়ে উপায় থাকে না, এই আর কী।"

"কিন্তু টাকা যে তাঁরা ফেরত দেন না, সেটা তো সত্যি?"

"হ্যাঁ...মানে অনেক সময় ফেরত পাই না ঠিকই, তবে কিনা ইচ্ছে করে যে তারা ফেরত দেয় না, তাও নয়, পারলে নিশ্চয় দিয়ে দিত, তা সকলেই তো ছা-পোষা মানুষ, সব সময়ে বোধ হয় পেরে ওঠে না..."

মা ইতিমধ্যে ঠাকুর্দার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মস্ত করে ঘোমটা টানা, কিন্তু ঘোমটার ফাঁক দিয়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম যে, তিনি নিঃশব্দে হাসছেন। ফিসফিস করে ঠাকুর্দাকে বললেন, "আইজ পর্যন্ত একজনও টাকা ফেরত দেয় নাই বাবা।"

ঠাকুর্দা বললেন, "ইন্দ্র, বউমা নিশ্চয় মিথ্যে বলছেন না। আসল কথা, টাকা যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁরা তোমার চেনা-মানুষ হতে পারেন, কিন্তু বন্ধু নন। তাঁরা তোমাকে ঠকাচ্ছেন। তা হলে তুমি তাঁদের বিশ্বাস করে টাকা দিচ্ছ কেন?"

ম্লান মুখে বাবা বললেন, "হয়ত ঠকাচ্ছে, কিন্তু উপায় কী, কেউ কিছু চাইলে আমি 'না' বলতে পারি না, আর তা ছাড়া অবিশ্বাস করে জেতার চাইতে বিশ্বাস করে ঠকাই হয়ত ভাল।"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ঠাকুর্দা। তারপর বললেন. "ইন্দ্র, ওটা অক্ষমের যুক্তি। এমন মানুষের যুক্তি, যে কিনা ভাল-মন্দের, খাঁটি-ঝুটার তফাত বোঝে না। আর তা ছাড়া, তুমি ঠকছ বটে. কিন্তু বিশ্বাস করলেই যে ঠকতে হবে, এমন কথা তোমাকে কে বলল? আমি তোমাকে অবিশ্বাসী হতে বলি না, শুধু বলি যে, মানুষ চিনে যারা বিশ্বাস করে, তাদের কখনো ঠকতে হয় না। তারা জানে

যে, বিশ্বাস করেও জেতা যায়। ইন্দ্র, তুমি মানুষ চিনতে শেখো।"

বড়-কাকীমা ইতিমধ্যে জলের ছিটে দিয়ে, মেঝে নিকিয়ে, ঠাঁই করে, ভাত বেড়েছিলেন। ঠাকুমা বললেন, "কাইল আবার বাপ-ব্যাটায় তক্ক কইরো, এখন উইঠা খাইতে বইসো তো দেখি।"

ঠাকুর্দা বললেন, "তিনটে আসন করেছ কেন?"

ঠাকুমা বললেন, "রনো আর বিশ্ব এখন খাবে না। পরে তারা আমাগো সংগে বসবে।"

মাঝখানের পিঁড়িতে ঠাকুর্দা বসলেন। দু' পাশে বাবা আর বড়-কাকা। বড়-কাকা একেবারে কনে-বউয়ের মতো জড়সড় হয়ে বসে ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মা একটা হাতপাখা নিয়ে তাঁদের বাতাস করতে লেগে গেলেন।

খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর্দা বললেন, "চন্দ্র, তোমার পড়াশুনো ঠিক-মতো হচ্ছে তো? নাকি সেই আগের মতোই ঘুড়ি আর পায়রা নিয়ে মেতে আছ?"

মা হেসে ফেললেন। বড়-কাকা তাঁর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। অন্য সময়ে বড়-কাকার মুখে যেন কথার খই ফোটে, কিন্তু বাবা আর ঠাকুর্দার সামনে তিনি চুপ। ঘাড় গুঁজে যেমন খাচ্ছিলেন, তেমনি খেয়ে যেতে লাগলেন।

বাবা বললেন, "চন্দ্র এবারে ফোর্থ ইয়ারে উঠল। সেদিন একটা প্রশ্নের উত্তর লিখে আমাকে দেখিয়েছিল। তা ইংরিজী তো দেখলুম ভালই লেখে।"

ঠাকুর্দার পাতে একটা মুড়ো দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে তিনি বাবার পাতে তুলে দিয়ে বললেন, "ঈশানের বাড়িতে মাঝে-মধ্যে যাও তো?"

বাবা বললেন, "প্রায়ই যাই। প্রেসিডেন্সিতে যখন বি এ পড়তুম, তখন ওঁর বড় ছেলে আমাদের ক্লাস নিতেন তো, তখন থেকেই আমাকে খুব ভাল-বাসেন। এখন তো হপ্তায় একদিন ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে যাই, সেখানে তাঁর সংগে দেখা হয়ে যায়, আর দেখা হলেই বাড়িতে যেতে বলেন।"

"প্রফুল্লর সংগে যখন দেখা করতে যাও, তখন ঈশানের সংগে দেখা হয় না?"

"প্রায়ই হয়। দেখা হলেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন। ছেলেবেলার গল্প বলেন। আপনি নাকি দারুণ সাঁতার কাটতে পারতেন?"

ঠাকুর্দা সে-কথার উত্তর না দিয়ে হাসলেন। তারপর, খানিকক্ষণ বাদে, অন্যমনস্কভাবে বললেন, "কলকাতায় থাকতে ওর জাতকের অনুবাদের প্রথম খণ্ড দেখেছিলুম, পরের খণ্ডগুলো আর দেখা হল না।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। জাগীর-দাদা ইতিমধ্যে তামাক সেজে রেখেছিল। ঠাকুর্দা গিয়ে বিছানায় বসে তামাক টানতে লাগলেন। বাবাও বারান্দা থেকে ঘরে এসে বাটা থেকে এক মুঠো খিলিপান তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। তারপর আমাদের বিছানার ধারে বসে, হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে

বললেন, "কী রে ন্যাওটা, আইজ কি আমার কাছে শুবি নাকি?"

শুতে ভীষণ লোভ হচ্ছিল। কিন্তু অন্য দিকে ভয় হচ্ছিল যে, আমি গিয়ে বাবার কাছে শুলেই দিদি আর ছোট-পিসি অমনি ঠাকুমাকে দখল করে নেবে। তাই কী যে করি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না। ঠাকুমা বললেন, "থাক্, কাইল তো তোরা মাঝ-রাত্তিরে আইসা পৌঁছাইছিস, আইজ দিনের বেলাতেও ঘুমাইতে পারিস নাই, তুই গিয়া এখন শান্তিমতো ঘুমাইয়া পড়, অমু বরং আমার কাছেই থাক্।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাবা দোতলায় উঠে গেলেন।

হ্যাজাগ দুটো আগেই নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দরজা বন্ধ করে, হ্যারিকেনের পলতেটাকে রোজকার মতন নামিয়ে দিয়ে, 'দুর্গা দুর্গা' বলে ঠাকুমা এসে খাটে উঠলেন। আমিও অমনি চটপট তাঁর একটা দিকের দখল নিয়ে নিলুম। ঠাকুমার আর-এক পাশে কে শোবে, তাই নিয়ে দিদি আর ছোট-পিসির মধ্যে লড়াই বেধে গেল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, আজকের মতো দিদিই ঠাকুমার পাশে শোবে, আর কাল শোবে ছোট-পিসি।

পরশু নিয়ে কারও চিন্তা নেই। তার কারণ, দিদিরা পরশু দিন খাবাসপুরে চলে যাচ্ছে। আমি আর বাবা যাব তার পরের দিন। শুধু ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা এখানে থাকবেন। আমাদের গ্রামে কারও বাড়িতেই দুর্গাপুজো হয় না, কিন্তু খাবাসপুরে বাবার মামাবাড়িতে হয়। তাই ঠিক হয়েছে যে, পুজোর দিনগুলি আমরা সেইখানে গিয়ে কাটাব। পরশু ষষ্ঠী। দুপুরে যখন খাবাসপুরে যাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে মায়ের কথা হচ্ছিল, তখন বাবা বললেন, "ষষ্ঠীর দিনে আমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমরা সবাই যাও। ন্যাওটাকে নিয়ে আমি বরং সপ্তমীর দিনে যাব।"

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোবার আগে ঠাকুর্দা রোজ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার শেষে বলেন, "মঙ্গল হোক, সকলের মঙ্গল হোক।" আজও সেই কথাগুলি তাঁকে বলতে শুনলুম। আমার ঘুম আসছে না। শুয়ে-শুয়ে নানান কথা ভাবছি। মনে হচ্ছে, বাবার কাছে শুলেই ভাল হতো। দিদি আর ছোট-পিসির জন্যে দুটো শজারুর-কাঁটা রেখে দিয়েছিলুম, তারা খুব খুশী, ছুঁচ-সুতোর বাক্সে খুব যত্ন করে তুলে রাখল, বলল যে, কলকাতায় গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের দেখাবে। বাবার কলেজে নাকি মহালয়ার দিনই ছুটি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কী সব খাতা-টাতা নাকি দেখবার ছিল, তাই দ্বিতীয়ার আগে তিনি রওনা হতে পারেননি। রাত্তিরবেলায় রেলগাড়িতে উঠে সকালবেলায় জেলা-শহরে পৌঁছলেন। তারপর সেখান থেকে নৌকো। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, নৌকো তো সন্ধের আগেই বাড়িতে পৌঁছবার কথা, তা এত রাত্তির হয়ে গেল কেন? তাতে বাবা বললেন, শশার চকে পথ হারিয়ে গিয়েছিল। শুনেছি, শশার চকে খুব ডাকাতি হয়। ডাকাতরা নাকি ছিপ-নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর তিনমাল্লাই-চারমাল্লাই নৌকো দেখলেই এগিয়ে এসে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। বলে, "ও মাঝিভাই,

এট্টু আগুন দিবার পারো?" কিন্তু কক্ষনো তাদের আগুন দিতে নেই, আগুন নেবার নাম করে তারা নৌকোয় এসে ওঠে, তারপর নৌকোর লোকদের মেরেকেটে সব লুঠ করে নেয়।

বাবার মুখে শশার চকের নাম শুনে তাই চমকে উঠেছিলুম। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ডাকাইত পিছু নেয় নাই তো?" তাতে মেজো-কাকা বললেন, "না, তার থিকাও সাংঘাতিক ব্যাপার। কানাহুলায় ধরছিল।" কানাহুলা আসলে এক রকমের পেত্নী, চোখে আগুন জেবলে তারা মাঠ বিল আর হাওরের মধ্যে ছুটোছুটি করে। দূর থেকে সেই আগুন দেখে আলো বলে মনে হয়, সবাই ভাবে যে, গ্রাম বুঝি খুব কাছে। তারপর খানিক গিয়ে দেখতে পায় যে, আলোটা হঠাৎ নিবে গেছে। তখন আবার আর-এক দিকে আলো জবলে ওঠে। জাগীর-দাদার কাছে শুনেছি, বীরপুরের গঞ্জ থেকে ফিরবার সময় সেও একদিন কানা-হুলার পাল্লায় পড়েছিল। সারারাত্তির মাঠের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে তারপর সকালবেলায় দেখতে পায় যে, বীরপুরেরই খেয়াঘাটে বসে আছে।

বাবা যখন বাড়িতে এসে পেঁছিলেন তখন মাঝরাত্তির। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠাকুমা আমাকে ঘুমের থেকে তুলে দিলেন। বললেন, "তোর বাবা আইছে, শিগগির আয়।" পুকুর-পাড়ে গিয়ে দেখি মস্ত একটা তিন-মাল্লাই ঘাসী নৌকো। তার কাছিটাকে আমাদের পেয়ারাগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এখন তো মাঠঘাট সব জলের তলায়, তাই নৌকো এখন আমাদের বাড়ির পুকুর পর্যন্ত চলে আসে। বাবা, মা, দিদি আর ছোট-পিসি ততক্ষণে নৌকো থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কাকারা জিনিসপত্র নামাচ্ছেন। মা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে, কপালে একটা চুমু খেয়ে তারপর বাবার কোলে তুলে দিলেন। বাবা বললেন, "তোর আর জবরটর হয় না তো?" আমি বললুম, "না।" আমি তো আর এখন কারও কোলে উঠি না, তাই খুব লজ্জা করছিল। বাবা বললেন, "তোর জন্যে একটা কাক-মারা বন্দুক নিয়ে এসেছি।" তাতে আমি বললুম, "সাইকেলটা আনছ তো?" তার উত্তরে বাবা বললেন, "না। এবার তো তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব ভাবছি, তাই আর বোঝা বাড়াইনি, কলকাতায় গিয়ে সাইকেল চালাস, কেমন?"

হিজলকান্দার ঢাকী-পাড়ায় ঢাক বাজছে। জলের উপর দিয়ে তার আবছা-মতন শব্দ ভেসে আসছে। দেওঘরেও এই রকম মাঝরাত্তিরে এক-একদিন দূর-থেকে-ভেসে-আসা ঢাকের শব্দ শোনা যেত। মা বলতেন, ঢাক নয়, সাঁওতালরা মাদল বাজাচ্ছে। আজ চতুর্থী। আর মাত্র দুটো দিন। তারপরই পুজো।

ষষ্ঠীর দিন সকালবেলায় মা, কাকীমা, দিদি, ছোট-পিসি আর কাকারা খাবাসপুরে চলে গেলেন। তিন-মাল্লাই যে নৌকোটাকে জেলা-শহর থেকে কেরায়া করে আনা হয়েছিল, সেটাকে আর ছাড়া হয়নি, বাবা তাদের বাড়তি কিছু টাকা

গিয়ে আটকে রেখেছিলেন। মাঝিরা শুনলুম ঢাকার লোক। রোজ দু' বেলা আমি তাদের 'সিধে' দিয়ে আসতুম। 'সিধে' মানে চাল, ডাল, আনাজ, তেল আর নুন। নৌকোর মধ্যে উনুন পেতে সেইসব জিনিস তারা খুব তরিবত করে রান্না করত। তাদের মধ্যে আবার একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো মাল্লা, রেশমের মতো ফুরফুরে সাদা দাড়ি, নাম গফুর আলি। ছইয়ের উপরে বসে তার কাছে অনেক গল্প শুনেছিলুম। সে-ই বলেছিল যে, বর্ষার সময়ে পদ্মার এ-কূল ও-কূল দেখা যায় না, আর ঝড়ের সময় সেই নদীর মধ্যে তাল-গাছের মতো উঁচু এক-একটা ঢেউ উঠতে থাকে। অমন নদী নাকি "দুনিয়ায় দুইডা নাই।" বর্ষাকালে এক-একদিন মাঝরাত্তিরে উঠে শুনতে পেতুম যে, দূরে কোথায় যেন 'গুম্ গুম্ গুম্' করে শব্দ হচ্ছে। ঠাকুর্দা বলেছিলেন, ও হচ্ছে "বরিশাল গান্"। কিন্তু সেটা যে কী বস্তু তা আর ভাল করে বুঝে নেওয়া হয়নি। গফুর আলির কাছে শুনলুম যে; সমুদ্রের তলায় একটা শয়তান আছে, সে যখন খুব রেগে যায়, তখন নিজের বুকে কিল মেরে ওই রকমের শব্দ করে। দিদিরা যখন রওনা হয়, তখন আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। পিছনের উঁচু গলুইয়ে দাঁড়িয়ে, হালে মোচড় মেরে মেরে নৌকোর মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে তাকিয়ে গফুর আলি বলল যে, খাবাসপুরে সওয়ারী নামিয়ে আড়িয়ল খাঁ হয়ে তার নৌকো এবারে ঢাকায় ফিরবে, ইচ্ছে হলে আমিও তাদের সঙ্গে ঢাকা যেতে পারি। আমি দাঁড়িয়েই রইলুম। এখন আমি বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

দুপুরবেলায় সেদিন বাবার সঙ্গে পুকুরে নেমে চান করলুম। অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁপাঝাঁপি হল। বাবার দেখলুম দারুণ দম। একটুক্ষণের জন্যেও না-জিরিয়ে সাঁতার কেটে চার-চারবার এ-পার ও-পার করলেন। তারপর আবার মাঝপুকুরে ডুব দিয়ে তলার থেকে মাটি তুলে আনলেন। দেখে তো আমি আর মেঘু অবাক।

রাত্তিরবেলায় সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পরে দোতলায় গিয়ে বাবার কাছে শুয়েছিলুম। দোতলার বারান্দায় কে যেন কবে সারি-সারি কাঠের বাক্স ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে পায়রা থাকে। সকালবেলায় তারা বাক্স থেকে উড়ে গিয়ে টিনের চাল আর উঠোনের উপরে গলা ফুলিয়ে বক্-বকম্ বক-বকম্ করতে করতে খুব ভারিক্কে চালে ঘুরে বেড়ায়, তারপর সন্ধের সময় আবার বাক্সের মধ্যে ফিরে আসে। ঠাকুমা অবশ্য 'পায়রা' বলেন না, বলেন 'কৈতোর'। সারা রাত্তির সেই কৈতোরগুলো খচ্মচ্ শব্দ করে। আজও করছিল। পশ্চিমের পুকুর থেকে আজও 'গুব্-গুব্-গুব্-গুব্' করে একটানা একটা শব্দ উঠছিল। কিন্তু বাবার কাছে শুয়ে আছি তো, আজ আর তাই আমার একটুও ভয় করছিল না।

ঘুমোবার আগে বাবা আমাকে প্যানডোরার গল্প বললেন। সেই যে একটা বাক্স খুলতেই তার ভিতর থেকে অনেক রকমের দুঃখ-কষ্ট বেরিয়ে এসেছিল,

সেই গল্প। তারপর বললেন, "এইবারে তুই একটা কবিতা বল্ তো।"

সঙ্গে-সঙ্গে আমি বিছানার উপরে উঠে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে শুরু করলুম :

"রামেদের বুধিগাই প্রসব হইল,
রামশ্যাম দুইভাই দেখিতে আইল।
রাম বলে কী আশ্চর্য দ্যাখো শ্যামভাই,
জিভ দিয়ে বাছুরের গা চাটিছে গাই।"

বাবা তো হেসেই বাঁচেন না। হাসতে হাসতে বললেন, "আর-একটা বল্।"

আমিও অমনি গড়গড় করে :

"গয়লা-বাড়ি যেতে হবে,
এক-পোয়া দুধ আনতে হবে,
ননী খাবে, ফনী খাবে,
চারুকে একটু দিতে হবে,
বউটি আছে পরের ঝি,
দুধ না দিলে বলবে কী,
কর্তা আবার আপিং খান,
দুধ না পেলে চলবে না,
পোড়া-মুখেও ক্ষীর না হলে রোচে না।"

আমি কবিতা বলছিলুম, আর বাবা সারাক্ষণ হো-হো করে হাসছিলেন। বললেন, "প্রথমে গোরু, তারপর দুধ, এর পরে কি দই, ক্ষীর আর পায়েসের কবিতা বলবি নাকি?"

আমি বললুম, "পায়েসের কবিতাও এট্টা শিখছি। শুনবা?"

"এখন থাক্। তা এ-সব কবিতা তোকে কে শেখাল?"

"ঠাকুমা। ক্যান্, এইগুলি খারাপ?"

তাই শুনে বাবা বললেন, "না না, খারাপ কেন হবে, খুব ভাল। তা তুই যদি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাস তো আরও অনেক অনেক কবিতা তোকে শিখিয়ে দেব। কী রে, যাবি তো?"

এই সব কথা শুনলেই আমার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। আমার যে কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না, তা নয়। কিন্তু সেখানে যাওয়া মানে তো ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বড়-কাকীমা আর জাগীর-দাদাকে ছেড়ে যাওয়া। মেঘু আর নেউলকে ছেড়ে যাওয়া। খালেক আর রব্বানকে ছেড়ে যাওয়া। এই পুকুর, এই গাছপালাকে ছেড়ে যাওয়া। ভাবতেই আমার ভীষণ খারাপ লাগে। রোজ রাত্তিরে আমার খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরেও ঠাকুর্দা আমাকে তাঁর পাতে বসিয়ে দুধ-ভাত খাইয়ে দেন। রোজ ভোরে তাঁর বিছানা থেকে বলেন, "অমলাংশুবাবুর ঘুম ভাঙল?"

ঠাকুর্দাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারব?

কিন্তু বাবাকে ছেড়ে থাকতেও আমার একদম ভাল লাগে না।

অন্ধকারের মধ্যেই বাবা আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলেন, "কী করে, যাবি তো? রোজ বিকেলে দুজনে মিলে গড়ের মাঠে খেলা দেখতে যাব। রোজ রাত্তিরে তোকে গল্প বলব। তুই রবিন হুডের গল্প শুনেছিস? রবিনসন ক্রুশোর? কী রে, শুনেছিস?"

আমি কোনও উত্তর দিই না। বাবার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, গুটিসুটি মেরে আমি শুয়ে থাকি। তারপর খানিক বাদে বলি, "বাবা, তুমি কইলকাতায় যাইও না।"

বাবা হো-হো করে হেসে ওঠেন।

॥ ১১ ॥

ঘুম থেকে উঠতে বাবার খুব দেরি হয়। ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা কিন্তু শেষ-রাত্তিরে উঠে পড়েন। দোতলা থেকে তাঁদের গলা শুনতে পেয়ে আমি নীচে নেমে এলুম। ভোরবেলার হাওয়ায় একটু শীত-শীত করে। ঠাকুমা একখানা শাড়িকে চার ভাঁজ করে, তাই দিয়ে আমার বুক ঢেকে দিয়ে, গলার পিছনে একটা গিঁট লাগিয়ে দিলেন। তখনও সূর্য ওঠেনি, কিন্তু পুবের আকাশ রাঙা হয়ে গেছে। অন্য দিন বড়-কাকীমা এই সময়ে 'নাড়া' দিয়ে উনুন ধরিয়ে চা করে দেন। আজ বড়-কাকীমা নেই। মা-ও নেই। তাই ঠাকুমা চা বানিয়েছেন। ঠাকুর্দা পেয়ালায় করে চা খান। কিন্তু ঠাকুমা খান কাঁসার গেলাসে। পুরো এক গেলাস চা না হলে তাঁর চলে না। চা ঢাললেই গেলাস অমনি তেতে ওঠে। তাই আঁচল দিয়ে গেলাস-টাকে ধরে তিনি ঠাকুর্দার বিছানার পাশের টুলের উপরে গিয়ে বসলেন।

আমি গিয়ে বিছানার উপরে উঠে পড়লুম। হাতে চায়ের পেয়ালা, পুবের জানলায় চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন ঠাকুর্দা। চোখ না ফিরিয়েই বললেন, "কী খবর অমলাংশুবাবু? বাবার কাছে শুয়ে কাল কেমন ঘুম হল?"

"খুব ঘুমাইছি। কাইল রাইতে আমার এট্টুও ভয় করে নাই।"

ঠাকুর্দা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তারপর শূন্য পেয়ালাটাকে ঠাকুমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দাদু, রাত্তিরটাকে একটু ভয় করা ভাল, তা নইলে সকালটাকে এত মিষ্টি লাগে না।"

ঠাকুমা বললেন, "কইলকাতায় তো আইজকাল শুনি খুব সুবিধা, রাত্তির-দিনে তফাতই বোঝা যায় না। আমরা তো লণ্ঠন জ্বালাইয়া থাকতাম, তা এখন নাকি সব বাড়িতেই ইলেকট্রিক ঢোকছে। বড়-বউমা কইতেছিল, বোতাম টেপলেই রাত্তির এক্কেরে দিন হইয়া যায়।"

ঠাকুর্দা আবার জানালার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। পুকুরের পুব দিকে কয়েক বিঘে নাবাল জমি, তারপরে আলিকান্দার খাল, খালের ও-পারে ধুধু মাঠের মধ্যে কয়েকটা তালগাছ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। আমরা বলি সাত-তালতলা। জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে, সেই তালগাছ-গুলোর ফাঁক দিয়ে সূর্যদেবের টকটকে রক্তবর্ণ মুণ্ড ধীরে-ধীরে দিগন্তরেখার উপরে উঠে আসছে। সেইদিকে তাকিয়ে ঠাকুর্দা খুব অস্ফুট গলায় বললেন, "রাতকে অমন আলো জ্বালিয়ে দিন বানাবার দরকার কী, বুঝি না।"

ঠাকুমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গেলাসটাকে মেঝেতে নামিয়ে তিনি খাটের নীচে ঠেলে দিলেন। তারপর বললেন, "অমুর বিষয়ে কিছু ঠিক

রল্‌লা?"

"কী ঠিক করব?"

"ওর পড়াশুনার কথা। গ্রামে এট্টা পাঠশালা ছিল, সেডা বন্ধ হইয়া গেল। কাছে-ধারে ইশকুলও নাই।"

"তাতে কি ওর পড়াশুনো কিছু আটকে থাকছে? এই বয়সেই ও প্রত্যেকটা গাছ চেনে, প্রত্যেকটা পাখি চেনে, কোন সময়ে কোন্‌ ফসল ওঠে বলতে পারে, দুই থেকে বারো পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘরের নামতা শিখেছে, একটা পয়সারও গণ্ডগোল না-করে হাট-বাজার করতে পারে, খনার বচন গড়্‌গড়িয়ে বলতে পারে, তার উপরে আবার রামায়ণ আর মহাভারতের প্রত্যেকটা গল্প ওর মুখস্থ।"

ঠাকুমা হেসে ফেললেন। বললেন, "থাম্‌লা ক্যান্‌, কও যে, তার উপরে আবার সাঁতার কাটতে পারে, গাছে ওঠতে পারে, বঁড়শি কোঁচ আর পলো দিয়া মাছ ধরতে পারে..."

ঠাকুর্দা বললেন, "পারেই তো। ইশকুলে গিয়ে কি এর চাইতে কিছু বেশী শিখত?"

"কিন্তু এই বিদ্যা তো শহরে কোনও কামে লাগে না।"

"শহরে ওর যাবার দরকার কী?"

আবার হেসে ফেললেন ঠাকুমা। বললেন, "বাঃ, খুব বুদ্ধির কথা কইছ! ইন্দ্ররে যখন তুমি খাবাসপুরে রাইখা কইলকাতায় ফিরছিলা, তখন তোমার কষ্ট হয় নাই? অরেও এইখানে রাইখা কইলকাতায় থাকতে অর বাবার খুব কষ্ট হয়।"

ঠাকুর্দা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ঠাকুমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ইন্দ্র এই কথা বলেছে?"

ঠাকুমা তখনও হাসছিলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, "না, ইন্দ্র আমারে কছু কয় নাই। কিন্তু আমি বোঝতে পারি।" তারপর একটু থেমে বললেন, "অমুরে ছাইড়া থাকতে তোমার কষ্ট হবে?"

ঠাকুর্দা বললেন, "না না, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আর তা ছাড়া, এক হিসেবে তুমি ঠিকই বলেছ। যার জিনিস, তার কাছেই তো থাকা উচিত।"

খাটের তলা থেকে পেয়ালা, পিরিচ আর গেলাসটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ঠাকুমা বললেন, "যাই, এখন ফ্যানাভাত বসাইতে হবে। অমু, তোর বাবারে গিয়া তুইলা দে।"

ফ্যানাভাত আর মাছভাজা খেয়ে বাবা আর আমি গিয়ে নৌকোয় উঠলুম। জাগীর-দাদা একটা সতরঞ্চি আর বালিশ নিয়ে ছইয়ের মধ্যে পেতে দিয়েছিল। বাড়ির নৌকো। খাল পেরিয়ে নদীতে পড়তেই ভরত-কাকা অমনি লগিটাকে ছইয়ের পাশ দিয়ে সর্‌সর্‌ করে ঠেলে দিয়ে বইঠা টেনে নিল। নৌকো যখন নদীতে পড়ে, স্রোতের টানে নৌকোর মুখ তখন ঘুরে যায়। জলের শব্দ পালটে যায়। সেই শব্দ শুনে আমি ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাবা বললেন, "ভরত, ওর দিকে একটু নজর রাখিস।"

ভরত-কাকা ইতিমধ্যে তার বাঁ পা দিয়ে বইঠাখানাকে পেঁচিয়ে ধরে, জলের মধ্যে সেটাকে মোচড়াতে মোচড়াতে নৌকোর মুখ আবার বীরপুরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পাটাতনের উপরে পা তুলে নিয়ে সে এখন হাত দিয়ে বইঠা টানতে শুরু করল। বইঠা যখন জল কেটে আবার উপরে উঠে আসে, তখন 'চড়াৎ' করে একটা শব্দ হয়। খানিক বাদে-বাদেই সেই শব্দটা আমার কানে এসে পেঁছিচ্ছিল। আশ্বিন মাস, টলটলে রোদ্দুর উঠেছে, ছইয়ের উপরে একটা হলুদ রঙের ফড়িং বসে আছে, নদীর জল গুঁড়ো-কাচের মতো চিকচিক করছে, খড়কুটো আর কচুরি-পানা স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে, এদিকে-ওদিকে শুশুকগুলো ভুস্ করে ভেসে উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছিল, দু' পাশে ধবধবে কাশের বন, অনেক উঁচুতে কয়েকটা চিল চক্কর মারছে—চারদিকে তাকিয়ে কী যে ভাল লাগছিল আমার!

বীরপুরের গঞ্জে নেমে বাবা দু' হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে আনলেন। একটা হাঁড়ি খুব বড়, অন্যটা ছোট। পাটাতন তুলে বড় হাঁড়িটাকে তিনি নৌকোর ডরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন ; ছোটটাকে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "যা পারিস খা।" তারপর, ছইয়ের মধ্যে ঢুকে একটা ইংরেজী বই নিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। খানিক বাদে আমিও গিয়ে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বই থেকে চোখ তুলে বাবা বললেন, "কী রে, ক'টা রসগোল্লা খেলি?"

"চাইরডা।"

"মাত্তর? তা এখন ঘুম পাচ্ছে?"

"না, এট্টা গল্প কও।"

"কিসের গল্প? যুদ্ধের?"

"না, কইলকাতায় সেই যে পার্সিয়ুসের গল্প কইছিলা, সেইডাই আবার কও।"

খাবাসপুরের খালে পেঁছিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বাবাকে দেখলুম সবাই চেনে। একটা নৌকোয় কারা যেন ঢাক বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। বাবাকে দেখে তারা হই-হই করে উঠল। কে একজন যেন ডোঙায় করে খাল পার হচ্ছিল। বাবাকে দেখে দূরের থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইন্দিরদা নাকি? কইল-কাতার থন্ কবে আইলেন?"

খালের পাড়ে একজন বুড়োমতন লোক দেখলুম হাতে একটা কোঁচ নিয়ে, একদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। নৌকোর থেকেই বাবা তাকে ডেকে বললেন, "কী রহমত-কাকা, ভাল আছ তো?" কপালে হাত তুলে, ভাল করে নজর করে, বুড়ো মানুষটি বললেন, "কেডা, আমাগো ইন্দর নাকি?"

খালের ধারে এক জায়গায় একটা তালের গুঁড়ি পড়ে আছে। তার উপরে বসে গিন্নীমতন কে একজন বাসন মাজছিলেন। বাসন মাজতে-মাজতেই আমাদের নৌকোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইন্দর না?"

"হ, মিত্তির-মামী।"

"খাবাসপুরের কথা কি একেরে ভুইলা গেছিলি নাকি?"

বাবা বললেন, "না মিত্তির-মামী, ভুলি নাই, একটানা পনরডা বচ্ছর যেখানে কাটাইছি, তারে ভুইলা যাওয়া কি সহজ কথা?"

"বাচ্চাডারে চেনলাম না তো?"

বাবা আমাকে দু' হাতে তুলে ধরে বললেন, "তোমার নাতি।" তারপর আমাকে পাটাতনের উপরে নামিয়ে দিয়ে : "তা তুমি যে এখন বাসন মাজতে লইছ? সোমেশ্বরের বউ কী করে?"

"বউর খুব জ্বর।"

"ডাক্তারের বউ হইয়া জ্বর বাধাইছে! সোমেশ্বর তাইলে কিসের ডাক্তার?"

মিত্তির-মামী হেসে বললেন, "সোমেশ্বর তো তোর মামাবাড়ির মণ্ডপে বইসা তাস পিটাইতেছে, কথাডা তারে গিয়াই জিগা।"

নৌকো যখন গাঙ্গুলীবাড়ির ঘাটে গিয়ে ভিড়ল, তখন সেখানে অনেক লোক। মা ছিলেন, কাকারা ছিলেন, খাবাসপুরের আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন, দিদি আর ছোট-পিসি ছিল, তা ছাড়া এমন আরও অনেক লোকজন এসে নৌকোর কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, এর আগে আর কখনও যাদের দেখিনি। মায়ের হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা তুলে দিয়ে বাবা বললেন, "যাও, মামীমার কাছে দিয়ে এসো।"

দিদি বলল, "শিগগির আয়, ঠাকুর দেইখা যা।" বলেই আমার হাত ধরে পুজো-মণ্ডপের দিকে দৌড় লাগাল।

সপ্তমী পুজোর সন্ধে। ঢাক বাজছিল, একটা কাঁসি তার সঙ্গে তাল রেখে কাঁই-নানা কাঁই-নানা করছিল, চাবি-বন্দুক আর ফট্‌কা ফাটছিল, বাচ্চারা চেঁচাচ্ছিল, সব মিলিয়ে সে এক হুলুস্থুলু ব্যাপার। আরতি দেখলুম। তারপর তুবড়ি জ্বালা হল, ফুলঝুরি আর রঙবাতি পোড়ানো হল, হাউই ছোঁড়া হল। উঠোনের একদিকে ছেলেমেয়েদের ভিড়। অন্যদিকে খান চারেক তক্তাপোষ জোড়া লাগিয়ে ফরাস পাতা হয়েছে। তার উপরে তাস পাশা আর দাবার আড্ডা বসেছে। বাবা গিয়ে সেইখানে দাঁড়াতেই সবাই হই-হই করে উঠল।

কারবাইড আর হ্যাজাগের আলোয় পুজো-মণ্ডপ ঝলমল করছে। অসুরটা হাঁটু গেড়ে তরোয়াল উঁচিয়ে আছে, কিন্তু একে তো তার বুকের মধ্যে মা-দুর্গার বর্শা বেঁধানো, তার উপরে আবার সিঙ্গিমামা তার হাঁটুর উপরে এমন থাবা মেরেছে যে, সেখান থেকে দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে; বাবার পাশে ফরাসের উপরে শুয়ে সেইদিকে আমি তাকিয়ে ছিলুম। সারাটা দিন নৌকোয় কাটিয়েছি, খুব সম্ভব সেইজন্যেই আমার মাথা ঘুরছিল। কিচ্ছু ভাল লাগছিল না। বাচ্চা-মতন একটা মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরঘুর করছিল। হঠাৎ সে আমাকে একটা ঠেলা মেরে বলল, "এই ছ্যামরা, তোর নাম কী?" এ-সব ক্ষেত্রে বলা নিয়ম "নাম দিয়া তোর কাম কী?" মেঘু কিংবা নেউল হলে তা-ই নিশ্চয় বলতুম, কিন্তু এটা নতুন জায়গা তো, তাই কোনও কথা না-বলে চুপ করে রইলুম। আসলে আমার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করছিল। দিদি আর ছোট-পিসিকেও দেখতে

পাচ্ছিলুম না। আরতির সময় ঢাকের পিঠে কাঠি পড়তেই তারা ছুটে এসেছিল কিন্তু আরতি শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা নিরুদ্দেশ।

ফরাসের উপরেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মেজো-কাকা এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন, "খাইতে আয়।"

ভিতর-বাড়িতে একটা লম্বা-মতন বারান্দায় বাচ্চারা সবাই খেতে বসেছে আমিও সেইখানে গিয়ে বসে পড়লুম। বাবার মামীমার অনেক বয়স। বারান্দার এক কোণে একটা চেয়ারে তিনি বসে ছিলেন, আর মা-কাকীমাদের মাঝে-মাঝে "ভাত নিয়া আইসো...বাচ্চাগো আর ওই ঝাল-চচ্চড়ি দেবার দরকার নাই...এট্টু তাড়াতাড়ি হাত চালাও তো তোমরা" এইসব বলছিলেন। অন্যদিন তো বড় কাকীমা আমাকে খাইয়ে দেন, আজ আমি পিঁড়ির উপরে বাবু হয়ে বসে নিজের হাতেই খেয়ে নিলুম। খাবাসপুরের মেজো-কাকীমা আমার হাত ধুইয়ে দিলেন। তারপর কখন যে শুয়েছি, ঘুমিয়েছি, কিচ্ছু আমার মনে নেই।

শুধু মনে আছে যে, মাঝরাত্তিরে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কে যেন আমার কপালে হাত রেখে বলেছিল, "অমুর দেখি জ্বর আইছে।"

সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন আর আমার জ্বর নেই, ওই যা শুধু মাথাটাই একটু ভার-ভার লাগছিল। কিন্তু মা তবু ছাড়লেন না। মুখ-চোখ ধুইয়ে, এক বাটি দুধ-বার্লি খাইয়ে, নতুন একটা জামা আর প্যাণ্ট পরিয়ে, চুল আঁচড়ে দিয়ে বাবাকে বললেন, "সকালবেলায় আর তাস-পাশা নিয়া বইসো না ছাওয়ালডা তো কাইল সারা রাত্তির ভাজা-ভাজা হইছে, সোমেশ্বর-ঠাকুরপোরে একবার দ্যাখাইয়া আনো।"

মিত্তির-বাড়ির সোমেশ্বর-কাকা তাঁর ডিসপেনসারিতে বসে ছিলেন। সেখানে তখন আর-কেউ ছিল না। বাবা বললেন, "সোমা, এইডারে এট্টু পরীক্ষা কইরা, ওষুধ দিয়া তোর কাছে বসাইয়া রাখ্, আমি তো কাউর সঙ্গে দ্যাখাই করতে পারি নাই, যাই, একবার বিশ্বাস-বাড়ির থিকা ঘুইরা আসি। তোর বউর খবর কী?"

"আইজ সকালে জ্বর নাই।"

ডিসপেনসারির বারান্দা থেকে বাবা গিয়ে উঠোনে নামলেন। পিছন থেকে সোমেশ্বর-কাকা বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরা আসিস। কাইল তো সাতশো পয়েণ্টে তোরা জিতছিস, আইজ তার শোধ না তুইলা ছাড়তে আছি না।"

যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে বাবা বললেন, "আমারে পার্টনার কইরা বয়, তা নইলে তোর জেতার আশা নাই।"

আমি একটা বেঞ্চির উপরে চুপচাপ বসে ছিলুম। বাবা চলে যেতে সোমেশ্বর-কাকা একটা চেয়ার টেনে আমার সামনে এসে বসলেন। তারপর আমার জিভের তলায় জ্বর-কাঠি গুঁজে দিয়ে, চোখের পাতা টেনে, বুকে-পিঠে আঙুলের উল্টোদিক দিয়ে টোকা মেরে বললেন, "এই হারামজাদা, তোর এত জ্বর হয় ক্যান্ রে?"

মুখের মধ্যে জ্বর-কাঠি, তাই আমি কিছু বলতে পারলুম না। কাঠিটা টেনে নিয়ে সোমেশ্বর-কাকা বললেন, "সাতানব্বুই। রোদ্দুরে লাগাইয়া জ্বর বাধাইছিলি; যা ব্যাটা, আইজ সিঙ্গি-মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাবি।"

আসবার আগে খাবাসপুরের মেজো-কাকীমা মাকে বলেছিলেন, "অমু তো কাইল রাত্তিরে পায়স খায় নাই, এহোন খাইয়া যাক।" তা মা বলেছিলেন, "ফিরা আইসা খাবে।" কথাটা আমার মনে ছিল, তাই সোমেশ্বর-কাকাকে জিজ্ঞেস করলুম, "পায়স খাইতে পারব তো?"

তাতে হো-হো করে হেসে উঠে সোমেশ্বর-কাকা বললেন, "একশোবার পারবি। হাজারবার পারবি। ব্যাটা, তর বাবা এককালে পাথর খাইয়া হজম করত, আর তার ছাওয়াল হইয়া তুই পায়স খাইতে পারবি না? তর বাবার গায়ে কত শক্তি আছিল জানিস? মোটাগাটা এট্টা মানুষরে তার বিছানার থিকা তুইলা লইয়া জানলা দিয়া দশ হাত দূরে পুখুরের মইধ্যে ফিক্কা মারছিল?"

অবাক হয়ে আমি বললুম, "কারে?"

তাতে সোমেশ্বর-কাকা আমার চাইতেও অবাক হয়ে বললেন, "ক্যান্, তুই জানস না? আমাগো বীরপুর ইশকুলের হেড-মাস্টারমশাইরে।"

তারপর গলা নামিয়ে লাজুক-লাজুক ভাবে বললেন, "দোষ অবৈশ্য আমারই। আমরাও তো তর বাবার সঙ্গে বোর্ডিং-বাড়িতে থাকতাম। টেস্ট পরীক্ষায় তর বাবা ফাস্ট হইল। আর আমরা তিন-চাইরজন পাশই করতে পারলাম না। তখন আমরা পোলাপান, মাথা গরম, তাই ঠিক করলাম যে, হেডমাস্টারমশাইরে মাইর লাগাব। তা তর বাবা সেই কথা জানতে পাইরা রাত্তিরবেলা আমাগো আগেই মহেশবাবুর ঘরে ঢুইকা জান্‌লা দিয়া তানরে পুখুরের মইধ্যে ফেইলা দেয়। তা নাইলে সেই রাইতে মহেশবাবুর খুব মুশকিল আছিল। মহেশবাবু তো আর ভিতরের ব্যাপার জানেন না, ইন্দররে চিনা ফালাইয়া তিনি কইয়া বসলেন যে, সে-ই তানরে মারবার চাইছিল। আসলে যে ইন্দর তানরে বাঁচাইয়া দিছে, তা তিনি বোঝলেন না।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন সোমেশ্বর-কাকা। কথা বলতে বলতেই তিনি আমার জন্যে একটা ওষুধ বানাচ্ছিলেন। ওষুধ বানিয়ে, শিশিতে ঢেলে, তাতে দাগ-কাটা একটা কাগজ সেঁটে দিয়ে বললেন, "বাড়িতে ফিরাই এক দাগ খাবি। তারপর বৈকালে এক দাগ আর রাত্তিরে শোবার আগে এক দাগ।"

আর-একজন মানুষ এই সময়ে "সোমা আছস নাকি রে" বলে ডিসপেনসারি-ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তাঁর গোঁফ অনেকটা কাঁকড়া-বিছের ল্যাজের মতো। আমার দিকে আঙুল তুলে, ভুরু নাচিয়ে তিনি সোমেশ্বর-কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এডা আবার কেডা?"

ঠাকুর্দা বলেন, কক্ষনো কারও দিকে আঙুল তুলে কথা বলতে নেই, তা ছাড়া গোঁফ দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল, আমি তাই দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে, হাসি চেপে, চুপ করে বসে রইলুম।

সোমেশ্বর-কাকা বললেন, "ইন্দরের ছাওয়াল।"

"ইন্দর কোথায়?"

"বিশ্বাস-বাড়ির দিকে গেছে। তার কথাই তো হইতেছিল। শিবু, বোর্ডিং বাড়ির সেই রাত্তিরের কথা তর মনে নাই?"

"তা আবার মনে নাই?" গোঁফওয়ালা মানুষটি বললেন, "সেই কথা ভাবলে আইজো গায়ে কাঁটা দেয়। উঃ, ইন্দর সেইদিন এক মহাপাতকের হাত থিকা আমাগো বাঁচাইয়া দিছে। তয় কিনা আমাগো দোষ স্বীকার পাওয়া উচিত ছিল, ইন্দরের গায়ে তাইলে আর এট্টা মিথ্যা-কলঙ্কের দাগ পড়ত না।"

আবার লাজুক-লাজুক ভাবে হাসলেন সোমেশ্বর-কাকা। তারপর বললেন, "শিবু, তর মনে থাকা উচিত, ইন্দর যে বিপদে পড়ছে, এই কথা বোঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দোষ স্বীকার পাইতে চাইছিলাম। তা ইন্দরই আমাগো এস-ডি-ও-র কাছে যাইতে দিল না। কইল, 'সোমা, তোগো শাস্তি আমি নিলাম, আমি কাউরে কিছু কব না, আমার যা হবার হউক, তোরা তো এই বচ্ছর ফেল করছিস, অ্যালাউ হইতে পারিস নাই, এহোন ঠিকমতন পড়াশুনা কইরা সামনের বচ্ছর পাশ করবার চেষ্টা কর্।' তা তার কথা আমি রাখছি।"

সোমেশ্বর-কাকা খুব মজার লোক। বড়রা তো কক্ষনো ছোটদের সামনে তাঁদের নিজেদের দোষের কথা বলেন না, কিন্তু তিনি দেখলুম আমার সামনেই তাঁর ছেলেবেলাকার দুষ্টুমির কথা দিব্যি বলে যাচ্ছেন। যেন আমি তাঁদেরই বয়সী। আমিও তাই সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "তা হেডমাস্টারমশাইরে বাবা ওইভাবে পুখুরের মইধ্যে ফেইলা দিল ক্যান্?"

সোমেশ্বর-কাকা যাঁকে 'শিবু' বলছিলেন, গোঁফওয়ালা সেই লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বললেন, "আরেব্বাবা, ইন্দরের ছাওয়াল দেখি এক্কেরে উকিলের মতন জেরা করে।"

সোমেশ্বর-কাকাও আমার প্রশ্ন শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "তর বাবা ভাবছিল, সাঁতরাইয়া পুখুর পাড়ি দিয়া মহেশবাবু বাঁইচা যাবেন। অত বড় মানুষটা যে সাঁতার শেখে নাই, তা কি আর সে জানে? কইলকাতার মানুষগো ওই এক মহা মুশকিল। গাছে চড়তে পারে না, সাঁতার দিতে জানে না, কেউ-কেউ তো আবার ধানগাছের তক্তা দিয়া বাড়ি করবার স্বপ্ন দেখে। তা মহেশবাবুর কপাল ভাল, ঘাট্‌লার কাছাকাছিই পড়ছিলেন, জল সেইখানে কম, তা নাইলে তো সেইদিন হিতে বিপরীত কাণ্ড হইত।"

পুজোর দিনগুলি যে কোথা দিয়ে কী ভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারলুম না। সপ্তমীর রাত্তিরে সেই যে মেয়েটা 'এই ছ্যামরা তোর নাম কী' বলে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রথম তাকে একদম ভাল লাগেনি, কিন্তু পরে তার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল আমার। মেয়েটার নাম পুটু। তার দাদার নাম বংশী। সে আমার চাইতে এক বছরের বড়। বংশীরা খুব গরিব, তাই ইশকুলে যায় না, কিন্তু খুব সুন্দর ঘুড়ি বানাতে পারে। এখন শুধু 'পতং' ঘুড়ি বানায়, এর পরে

'বাক্স' আর 'ঢাউস' ঘুড়ি বানাবে। বংশী বলল, "সামনের বচ্ছর তো আবার আসবি। তখন তরে এট্টা বাক্স-ঘুড্ডি বানাইয়া দেব।"

অষ্টমী আর নবমীর দিন পুঁটু আর বংশীর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে ঠাকুর দেখলুম। খাবাসপুর খুব বড় গ্রাম। মন্দারগ্রামে তো একটাও পুজো হয় না, কিন্তু খাবাসপুরে ছ-সাত বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। সেই ছ-সাতখানা ঠাকুর নিয়ে ভাসানের দিন রাত্তিরে খুব বাইচ হল। বাবা গিয়ে বাইচের নৌকোয় উঠেছিলেন। আমাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা আমাকে যেতে দেননি। বাইচের পরে খুব ঢাক-ঢোল বাজিয়ে খালের মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে সবাই ফিরে এলেন। শান্তিজল মাথায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে বড়দের প্রণাম করলুম। কত লোক যে সেদিন এসেছিল। সকালবেলায় বীরপুরে লোক পাঠিয়ে বাবা আবার অনেক মিষ্টি আনিয়েছিলেন। সেই মিষ্টি সবাইকে দেওয়া হল। সব জায়গায় ভিড়, সকলের মুখে হাসি, শুধু মণ্ডপ-ঘরটা সেই বিকেল থেকে খাঁখাঁ করছিল। সেদিকে একেবারে তাকানো যাচ্ছিল না।

ভাসানের পরদিন আমরা মন্দারগ্রামে ফিরে আসি। মাঠের জল ইতিমধ্যে অনেকটা টেনে গিয়েছিল। বাবা বললেন, এর পরে আর বড়-নৌকা চলবে না। তা ছাড়া তাঁর ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় ফিরে—কলেজ খুলবার আগেই—দিন কয়েকের জন্যে পুরী থেকে ঘুরে আসবেন।

সমস্যা বাধল আমাকে নিয়ে। আমার যেতেও ইচ্ছে করছিল, আবার থাকতেও ইচ্ছে করছিল। বাবা বুঝলেন, আমি দোটানায় পড়েছি। বললেন, "ইচ্ছে ছিল, তোকে নিয়ে সমুদ্দুরের ধারে ঘুরে বেড়াব, ঢেউয়ের মধ্যে চান করব, চিল্‌কায় গিয়ে পাখি মারব, তা তোর যখন ইচ্ছে নেই, তখন থাক্‌। তা ছাড়া দাদুর কাছে তো তুই ভালই আছিস। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শিখেছিস, শুভঙ্করী শিখেছিস, জ্বরটরও আর আগের মতো হচ্ছে না, আমি বরং কলকাতায় গিয়ে কাউকে দিয়ে তোর সাইকেলটাকে পাঠিয়ে দেব, কেমন?"

আমি কেঁদে ফেললুম। মা যে কী বুঝলেন, কে জানে, ঠাকুর্দাকে গিয়ে বললেন, "বাবা, অমুর ভাব দেইখা মনে হয় যে, আপনারে ছাইড়া অর কইলকাতায় যাবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু এইখানে তো ইশকুলের সুবিধা করা গেল না। এহোন আপনে যদি এট্টু বুঝাইয়া কন।"

ঠাকুর্দার কাছ থেকে আমি পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। জাগীর-দাদাকে দিয়ে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর কাছে বসিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "দাদু, বড়দের অবাধ্য হতে নেই। তা ছাড়া, খুব বেশীদিন তো আর তোমাকে কলকাতায় থাকতে হচ্ছে না, সামনের বছরেই আলিকান্দায় একটা মাইনর-ইশকুল খুলবে শুনলুম, বাস্‌, ইশকুল খুললেই তোমাকে আবার এইখানে নিয়ে আসব।"

কবে রওনা হয়েছিলুম আমরা? লক্ষ্মীপুজোর আগে, না পরে? মনে নেই। শুধু আবছা-মতন মনে পড়ে যে, বীরপুর থেকে একটা তিনমাল্লাই নৌকো কেরায়া

করে আনা হয়েছিল। বড়দের প্রণাম করে, জল-ভরা ঘটের দিকে তাকিয়ে, বাবার হাত ধরে আমি নৌকোয় গিয়ে উঠেছিলুম। নৌকো থেকে দেখতে পেয়েছিলুম, সবাই এসে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বড়-কাকীমা, জাগীর-দাদা, মেঘু, নেউল, বনো-দিদি, নিতাই-দাদা, কালাদা—সবাই। ভুবন-দাদুও এসেছিলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে শূন্য চোখে তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আইনদ্দী-কাকা আমাদের জেলা-শহর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে; আমাকে কোলে নিয়ে সে ছইয়ের উপরে গিয়ে বসল।

পুকুরের ধার দিয়ে নৌকো গিয়ে উত্তরের মাঠে পড়ল। দুদিকে জলে-ডোবা ধানখেত। মাঝখানের দারা দিয়ে নৌকো চলেছে। বড়-মিত্তিরবাড়ির ঘাটলায় কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হল, কাজল-দিদি।

॥ ১২ ॥

বুড়ী ছোঁয়ার মতো মাত্র দিন তিনেক সে-যাত্রায় কলকাতায় ছিলুম, তারপরেই আমরা পুরী চলে যাই। আমরা মানে বাবা, মা, ছোট-পিসি, দিদি আর আমি।

এর আগে আর-কখনও সমুদ্র দেখিনি। দেওঘরে গিয়ে পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে—শুধু পাহাড় কেন—আকাশ ছাড়া আর কোনও-কিছুরই তুলনা হয় না, ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে প্রথম যখন সমুদ্র দেখি, সত্যি তখন মনে হয়েছিল যে, আকাশটাকেই যেন উলটে ফেলে মাটির উপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এমন কী, নীল সমুদ্রের মধ্যে ইতস্তত-ছড়িয়ে-থাকা ঢেউয়ের সাদা ফেনাগুলোকেও ঠিক শরৎ-আকাশের সাদা মেঘের টুকরো বলে আমার মনে হচ্ছিল। বুকের মধ্যে অমন বিষম ধাক্কা আর কখনও লাগেনি।

সমুদ্র যে খুব বড় একটা ব্যাপার, তা অবশ্য জানতুম। কিন্তু তাই বলে যে এত বড়, তা আমার কল্পনায় ছিল না। রাত্তিরবেলায় রেলগাড়িতে বসে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "সমুদ্র কত বড়, বাবা?"

"খুব বড়।"

"আমাদের বড়-পুকুরের থিকাও অনেক-অনেক বড়?"

"অনেক অনেক অনে—ক বড়।"

"শশার চকের থিকাও বড়?"

"তার চাইতেও অনে—ক বড়।"

"আড়িয়ল খাঁর থিকাও বড়?"

"হাজারটা আড়িয়ল খাঁকে পাশাপাশি রাখলে যত বড় হয়, তার চাইতেও অনেক অনেক বড়।" হেসে ফেলে বাবা বললেন, "নে এখন ঘুমিয়ে পড়, কাল সকলেই তো পৌঁছে যাচ্ছিস, সমুদ্র যে কত বড়, নিজেই তখন বুঝতে পারবি।"

কটক থেকেই একজন বুড়োমতন লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। তার হাতে একটা লম্বামতন খাতা। বাবার নামধাম জিজ্ঞেস করে, তারপর সেই খাতা খুলে সে বলল যে, মানকরের ভুবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় যখন পায়ে হেঁটে শ্রীক্ষেত্রে এসে-ছিলেন, তখন তার ঠাকুর্দার বাবা তাঁকে সমস্ত মন্দির দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা যেন অন্য কোনও পাণ্ডা না নিই, সে-ই আমাদের সব দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ভুবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কে বাবা?"

বাবা বললেন, "তোর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা।"

পুরী ইস্টিশান থেকে একটা গোরুর গাড়ি নেওয়া হল। তার উপরে নৌকোর

মতন ছই। ছইয়ের তলায় পুরু করে খড় বিছানো। সেই খড়ের উপরে বসে অবাক হয়ে আমি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। লাল মাটির রাস্তা। তার ধারে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। সমুদ্র মাঝে-মাঝে সেই বাড়িগুলোর পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

বাবা বললেন. "এই ন্যাওটা, আমরা পৌঁছে গেছি।"

গোরুর গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হল। রাস্তা থেকে বালিয়াড়িতে নেমে, খানিকটা পথ বালি ভেঙে আমরা বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। সাজানো-গোছানো ছিমছাম বাড়ি। দুটো অংশে ভাগ করা। একটা অংশে দুখানা ঘর, অন্য অংশে চারখানা। শুনেছিলুম, ছোট অংশটা এক অবাঙালী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। আমরা থাকব বড় অংশটায়।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে মা বললেন, "দয়া, তুই আর জুঁই এবারে ঘরদোর পরিষ্কার করে ফ্যাল, আমি গিয়ে রান্নার জোগাড় করি।"

বাবা বললেন, "এখন আবার বাজারে যেতে হবে নাকি?"

মা বললেন, "না, চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ-তেল-নুন আমার সঙ্গেই আছে, স্টোভটাও নিয়ে এসেছি, চটপট খিচুড়ি আর আলুভাজা করে দিচ্ছি, তাই দিয়েই আজ চালিয়ে নাও, কাল সকালে বাজারে গেলেই হবে।"

ছোট-পিসি আর দিদি দুটো ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁটপাট দিতে লেগে গেল। আমি আর বাবা গিয়ে সমুদ্রের দিকের বারান্দায় বসলুম। আমাদের সামনে আর কোনও বাড়ি নেই, শুধু বালি আর বালি। তার মধ্যে এখানে-ওখানে কয়েকটা বেঁটে-মতন কাঁটাগাছ। তারপরেই সমুদ্র।

দারুণ হাওয়া দিচ্ছিল। বালি উড়ছিল। সারাক্ষণ একটা গজরানির শব্দ ভেসে আসছিল। বারান্দার এক দিকে খান পাঁচ-ছয় বেতের চেয়ার পাতা। তার একটায় বসে, আর একটায় পা তুলে দিয়ে বাবা বললেন, "হাওয়ার মধ্যে ওজোন আছে। হাঁ করে বাতাস খেয়ে যা। দেখবি, অসুখ-বিসুখ তোকে আর ছুঁতেও পারবে না।"

'ওজোন' যে কী বস্তু, তা বুঝতে পারলুম না। তবে ধরে নিলুম যে, ভাল-কিছুই হবে। হাঁ করে সেই না-দেখা জিনিস খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা আমাদের বারান্দায় এসে উঠলেন। তখনও আমি হাঁ করে বাতাস খাচ্ছি। তাই দেখে সেই ভদ্রমহিলা আমার গালে একটা টোকা মেরে বললেন, "কী ব্যাপার, সবটা বাতাস কি তুমি একাই খেয়ে ফেলবে?"

বাবা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনাদের চিনলুম না তো?"

"আমার নাম বিক্রম দেশাই। আর ইনি আমার স্ত্রী সার্দা।"

"আ—চ্ছা! আপনারাই তাহলে পাশের ঘরে আছেন। কলকাতায় থাকতে আপনাদের কথা শুনেছিলুম। কিন্তু কী জানেন, আপনাদের কথার থেকে

বুঝতেই পারা যায় না যে, আপনারা বাঙালী নন। এমন সুন্দর বাংলা বলেন আপনারা।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কেন বলব না? আমেদাবাদে জন্মেছিলুম ঠিকই, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে কলকাতায় আছি, আর ওঁর তো দু-পুরুষ কলকাতায় কেটে গেল, আপনাদের চাইতে কি আমরা কিছু কম-বাঙালী?"

মা ইতিমধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে দেশাইদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, "দিদি, আপনি কি রান্না চাপিয়ে দিয়েছেন?"

মা বললেন, "এই তো, এখুনি গিয়ে চাপাব।"

"দরকার নেই, এ-বেলা আপনারা আমাদের সঙ্গেই খান। ভয় নেই, আমরা মাছ খাই, আপনাদের কিছু অসুবিধে হবে না।"

বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কপালে মাছ লেখা রয়েছে, কে তা খণ্ডাবে বলো।"

বিক্রম দেশাই ডাক্তার-মানুষ। কলকাতার সাহেব-পাড়ায় তাঁর খুব পশার। বয়সে তিনি বাবার চাইতে বছর পাঁচেকের ছোট। আমরা তাঁকে বিক্রম-কাকা বলতুম। সেই হিসেবে তাঁর স্ত্রীকে নিশ্চয় কাকীমা বলা উচিত। কিন্তু তা আমরা বলতুম না। আমরা বলতুম সারদা-পিসি। সেইটে শেষ পর্যন্ত সার্দা-পিসিতে দাঁড়িয়ে যায়।

তাঁদের দুজনেরই চাল-চলন ছিল সাহেবদের মতো। চেয়ার-টেবিলে বসে, কোলের উপরে ইস্ত্রি-করা সাদা ধপধপে তোয়ালে রেখে, ছুরি-কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতেন; খাবার শেষে সেই তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছতেন। কেউ কখনও শব্দ করে হাসতেন না; এমন কী, হাই উঠলেও মুঠোর মধ্যে গোপন করে ফেলতেন। বিক্রম-কাকাকে আমি কখনও দিশী পোশাক পরতে দেখিনি। বাড়িতে তিনি পায়জামা আর—বিলিতী বইয়ের ছবিতে যেমন দেখা যায়, সেইরকম—একটা ঝলমলে ঝুল-পোশাক পরতেন; তার কোমরে একটা রেশমী দড়িতে গিঁট দেওয়া থাকত। বাইরে বেরোতেন প্যান্ট-শার্ট পরে। হাতে একটা লিকলিকে সরু ছড়ি নিয়ে। আর সার্দা-পিসিকে দেখে কে বলবে, তিনি মেম-সাহেব নন? মেম-সাহেবদের মতো পোশাক পরতেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর গায়ের রঙ ছিল ধপধপে সাদা, চোখের মণির রঙ ছিল নীলচে আর চুলের রঙ ছিল সোনালী। শুনে-ছিলুম যে, তাঁর মা ছিলেন মেম-সাহেব। তার উপরে আবার কখনো তিনি খোঁপা কিংবা বিনুনি বাঁধতেন না, ঢেউ -খেলানো একমাথা সোনালী চুল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তখন তাঁকে দেখলে মনে হতো যেন একরাশ আগুন আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমন এক ধরনের রূপ আছে, যার সামনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

সার্দা-পিসির রূপ ছিল সেইরকম। কিন্তু সেই রূপ সম্পর্কে তিনি যে খুব সচেতন ছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। কোনও লজ্জা-সংকোচেরও তিনি ধার ধারতেন না। সমুদ্রে স্নান করতে যাবার আগে, নীল রঙের গেঞ্জি-কাপড়ের খুব খাটো আর আঁটসাট একটা স্নানের পোশাক পরে তিনি আমাদের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। দল বেঁধে আমরা স্নান করতে যেতুম। বারান্দা থেকে নেমেই তিনি আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, "আয়।" আমার লজ্জা করত। আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু সার্দা-পিসির কাছ থেকে পালাবার উপায় ছিল না। চোখ পাকিয়ে বলতেন, "বালিতে পা পুড়ে যাবে। আয় বলছি।" তারপর ছুটে এসে আমাকে বুকে তুলে নিতেন। নরম-তুলতুলে সেই বুকের মধ্যে আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসত।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা সবাই বারান্দায় এসে বসতুম। বড়রা গল্প করতেন। আমরা ছোটরা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। সারাক্ষণ ঝোড়ো হাওয়া বইত। অথচ একটুও মেঘ নেই, আকাশ-ভর্তি জ্বলজ্বলে তারা। অন্ধকারের মধ্যেও ঢেউয়ের মাথার সাদা-সাদা ফেনা চোখে পড়ত। কখনও কখনও দেখতে পেতুম যে, সেই ফেনার একটা দীর্ঘ রেখা একদিক থেকে আর-একদিকে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে যাচ্ছে। মনে হতো যেন জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছি।

বাবা বলতেন, "সত্যি যেন স্বপ্ন। আমার প্রপিতামহ একদিন পায়ে হেঁটে এখানে এসেছিলেন, এই সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক আমারই মতো অবাক হয়ে এই জলের দিকে তাকিয়েছিলেন। ভাবতে গেলে মনে হয় যে, আমি যেন একটা আলাদা মানুষ নই, একই মানুষের আলাদা একটা টুকরো।"

পুরীতে গিয়ে সেবারে খুব ঘোরা হয়েছিল। অনেক মন্দির দেখেছিলুম, বিরাট দুটো পুকুর দেখেছিলুম, তার একটায় মস্ত-মস্ত মাছ দেখেছিলুম, ঘাটের কাছে মুড়ি ছড়িয়ে দিলেই তারা কপ্ কপ্ করে খেয়ে নিত। আমাদের বাড়ির কাছে একটা মস্ত হোটেল ছিল। রোজ সকালে বাবার সঙ্গে সেখান থেকে পাঁউরুটি কিনে আনতুম, পুরীতে তখন অন্য-কোথাও পাঁউরুটি পাওয়া যেত না। হোটেলের এক বুড়ো বাবুর্চীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে 'খোখাবাবু' বলত। তাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। বিক্রম-কাকাকে খুব ভাল লেগেছিল। সার্দা-পিসিকে খুব ভাল লেগেছিল। সূর্য-শঙ্কর পান্ডার বাড়ি থেকে যে লোকটা মাঝে-মাঝেই আমাদের জন্যে হাঁড়িভর্তি মিষ্টি-খিচুড়ি আর তালপাতার বাক্সে করে নানা রকমের মিষ্টি নিয়ে আসত, তাকেও খুব ভাল লেগেছিল

কিন্তু রতন-কাকাকে একদম ভাল লাগেনি। রতন-কাকারা চক্রতীর্থের একেবারে পুব প্রান্তে থাকতেন। দোতলা বাড়ি; সেই বাড়িতে একটা সুন্দর বাগান ছিল। তাতে অনেকগুলো গুলঞ্চফুলের গাছ ছিল। তার গন্ধে যেন

বাগানটা একেবারে বন্ধ হয়ে থাকত। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে রতন-কাকার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তখন কথায়-কথায় প্রকাশ পায় যে, তিনিও তালতলা-পাড়ার লোক, কাঠের ব্যবসা করেন, বউ আর ছেলেকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে এসেছেন। আলাপ-পরিচয় হবার পরেই বাবাকে তিনি 'দাদা' বলতে শুরু করেন। ফলে আমরাও তাঁকে কাকা বলতুম।

ঘটনাচক্রে পুরো একটা দিন তাঁদের চক্রতীর্থের বাড়িতে আমাকে কাটাতে হয়েছিল। বিক্রম-কাকা আর সার্দা-পিসি যেদিন কলকাতায় যান, তার দিন কয়েক বাদে গোরুর গাড়িতে করে আমাদের সাক্ষী-গোপালে যাবার কথা। আমার একটু সর্দিমত হয়েছিল, তাই মা আমাকে সঙ্গে নিলেন না। বললেন, "রোদ্দুর লাগলে ওর শরীর আরও খারাপ হবে, ওকে বরং রতন-ঠাকুরপোর বাড়িতে রেখে এসো। সারাটা দিন ওখানে থাক্, রাত্তিরে নিয়ে এলেই হবে।"

বাবা আমাকে সেই অনুযায়ী সাত-সকালে রতন-কাকাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সব শুনে রতন-কাকা বললেন "বাঃ, এ তো খুব ভাল কথাই। বাপ্পার একজন সঙ্গী হল, দুজনে দিব্যি গল্প করবে; যান দাদা, আপনারা নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুরে আসুন, অমুর জন্যে কিচ্ছু ভাববেন না।"

দুপুরে কিন্তু সেই শান্ত মানুষটির একেবারে ভিন্ন চেহারা দেখলুম। খাওয়া-দাওয়ার পরে দরজা ভেজিয়ে বাপ্পার মা আর তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, আমি আর বাপ্পা চোর-পুলিস খেলছিলুম, বাপ্পা একবার পুলিস হল, আমি চোর হয়ে পা টিপে-টিপে রতন-কাকার শোবার ঘরের দরজাটা অল্প-একটু ঠেলে ভিতরে ঢুকে, দরজাটা আবার সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে যেই 'টু' দিয়েছি, রতন-কাকা অমনি ধড়মড় করে তাঁর বিছানা থেকে নেমে এসে ঠাস্ করে আমার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, "বজ্জাত ছেলে, দাঁড়াও তোমার বদমাইসি আমি বার করছি।"

বিছানা থেকে বাপ্পার মা-ও নেমে এসেছিলেন। পরনে শুধু একটা সায়া, মাথার চুল আলুথালু, চোখের কাজল গালের উপরে লেপটে আছে, এক হাতে সায়ার দড়ি ও অন্য হাতে রতন-কাকার হাত চেপে ধরে চাপা-গলায় তিনি বললেন, "এ কী, ওকে মারছ কেন? ছেড়ে দাও, পাগলামি করো না, এক্ষুনি হয়তো বাপ্পা এখানে এসে পড়বে।"

ধাক্কা মেরে ঘর থেকে আমাকে বার করে দিলেন রতন-কাকা। তারপর দরজাটা ফের বন্ধ করে দিলেন।

এর আগে আর কেউ কখনও আমাকে মারেনি। ব্যাপারটা যেন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলুম না। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু কাঁদতেও যেন ভীষণ অপমান লাগছিল আমার। সেই সঙ্গে ভীষণ ভয়ও করছিল। মনে হচ্ছিল, কান্নার শব্দ কানে গেলেই রতন-কাকা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে মারবেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ করে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। বাপ্পা আমার হাত ধরে বলল, "চল্, বাগানে যাই।" আমি গেলুম না।

বিকেলে আবার রতন-কাকা সেই শান্ত মানুষ। মাঝে-মাঝেই বলছিলেন, "অমু বড় লক্ষ্মী ছেলে।" তাতে আমার ভয় আরও বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তখন আমায় মারলেনই বা কেন, আবার হঠাৎ এখন এত প্রশংসাই বা কেন করছেন, কিছু আমি বুঝতে পারছিলুম না। ভয় হচ্ছিল, অভিমান হচ্ছিল, গলার মধ্যে কিছু-একটা আটকে যাচ্ছিল; ক্রমাগত মনে হচ্ছিল, বাবা এলে বেঁচে যাই।

বাবা যখন এলেন, বাপ্পা তার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রতন-কাকা বললেন, "কী দাদা, কীরকম দেখলেন?"

বাবা বললেন, "ভাল। তোমরাও একদিন গিয়ে ঘুরে এসো। তা অমু তোমাদের বিরক্ত-টিরক্ত করেনি তো?"

রতন-কাকা বললেন, "কী যে বলেন, ওর মতো এমন ঠাণ্ডা ছেলে দেখাই যায় না।"

বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি কান্নায় ভেঙে পড়লুম। বাবা যত জিজ্ঞেস করেন, "কী রে, কী হল, কাঁদছিস কেন," ততই আমার কান্না আরও বেড়ে যায়। কাঁদি আর বলি, "আমি এইখানে থাকব না...আমারে দাদুর কাছে পাঠাইয়া দ্যাও... আমি দাদুর কাছে যাব।"

অন্ধকার সমুদ্রতীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাড়ি ফিরছিলুম। বাবা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "ওই দ্যাখ্, ফসফরাস জ্বলছে।"

আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না। সারা দিন ধরে যত কান্না আমি জমিয়ে রেখেছিলুম, সব এখন বেরিয়ে আসছিল।

॥ ১৩ ॥

পুরী থেকে কলকাতায় ফিরবার পরে আমাদের বাড়িতে একটা অদ্ভুত ঘটনা. ঘটে। দুপুর বেলা। বাবা কলেজে গেছেন, দিদি আর ছোট-পিসি ইশকুলে, কাকারাও কেউ বাড়িতে নেই। বাঁধানো একখানা 'মানসী ও মর্মবাণী'র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে মা এই সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন, আর আমিও অমনি সুট করে বিছানা থেকে নেমে রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনতে থাকি। সেদিনও তেমনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় রাস্তা থেকে একজন বুড়ী আমাকে ডেকে বলল, "ও খোকা, এইটে কি ইন্দ্রজিৎ চাটুজ্যের বাড়ি?"

মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ।

"ইন্দ্রজিৎ তোমার কে হয়?"

"বাবা।"

"তোমার বাবা বাড়িতে আছে?"

"না।"

"তা হলে তোমার মাকে একবার ডেকে দাও।"

দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে, ধাক্কা দিয়ে মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে বললুম, "মা, একজন বুড়ী তোমারে ডাকে।"

ঘুম-চোখে মা বললেন, "জ্বালিয়ে মারল। নিশ্চয় সেই বাসনউলী বুড়ী। বল্ যে, এখন আর ছেঁড়াফাটা কাপড় নেই, এ-মাসে আর বাসন নেব না।"

আমি বললুম, "না মা, বাসনউলী বুড়ী না। খুব সুন্দর দেখতে।"

"তাহলে নিশ্চয় দত্ত-বাড়ির মাসিমা। আর তো কাজ নেই, বসে বসে এখন শুধু পান খাবে আর বউয়েদের নিন্দে করবে।"

তারপর বারান্দায় এসে নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওমা, এ আবার কে।"

রাস্তা থেকে সেই বুড়ী বলল, "তুমি কি ইন্দ্রজিতের বউ?"

"হ্যাঁ।"

"একবার নীচে এসো বউমা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। পরনে চুল-পেড়ে ধুতি, মাথার চুল খাটো করে কাটা, ধপধপে ফর্সা রঙ, পাতলা ঠোঁটে অল্প-একটু হাসি মাখানো—বুড়ী এসে ভিতরে ঢুকল, তারপর আমার মায়ের থুতনি ধরে বলল, "দিব্যি বউ হয়েছে।"

মা বললেন, "আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।"

"কী করে চিনবে, আগে তো কখনও দেখনি।" বলে বুড়ী তার আঁচলের গিঁট

খুলে, ময়লা এক-টুকরো কাগজ বার করে, তার ভাঁজ খুলে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তবে এই নামটা হয়ত চিনতে পারো।"

উঁকি মেরে দেখলুম, গোট-গোট অক্ষরে তাতে লেখা রয়েছে : সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কাগজখানা হাতে নিয়ে, নামটা পড়বামাত্র মা যেন ভূত-দেখার মতো চমকে উঠলেন। বললেন, "এ তো আমার খুড়শ্বশুরের নাম!"

বুড়ী হাসল। বলল, "তোমার খুড়শ্বশুরকে তুমি কখনও দেখনি।"

"কী করে দেখব। আমি যখন এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসি, তার প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকে তিনি নিরুদ্দেশ। আমার শাশুড়ীও তাঁকে কখনও দেখেননি। শুনেছি, আমার খুড়শ্বশুরের বয়স যখন এগারো, তখন একদিন গঙ্গার ঘাটে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন।"

"তাঁর কোনও খবরও তোমরা জানতে না?"

"না। কিন্তু...কিন্তু আপনি কে? আপনি তাঁর নাম-লেখা এই কাগজ কোত্থেকে পেলেন?"

বুড়ী খুব ম্লান হেসে বলল, "মেয়েদের তো স্বামীর নাম করতে নেই। তাই একটা কাগজে তাঁর নামটা আমি লিখে এনেছি।"

গলায় আঁচল দিয়ে মা অমনি সেই বুড়ীকে প্রণাম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, "অমু, ইনি তোর ঠাকুমা হন...ছোট্‌-ঠাকুমা...প্রণাম কর্‌।"

আমি প্রণাম করতে যাচ্ছিলুম, ছোট্‌-ঠাকুমা আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

কলে জল আসবার খানিক বাদেই দিদি, ছোট-পিসি আর কাকারা সবাই ইশকুল-কলেজ থেকে ফিরে আসে। সব শুনে তারা তো অবাক। বড়কাকা তক্ষুনি সাইকেলে চেপে কলেজে গিয়ে বাবাকে ডেকে আনলেন। বাবা এসে ছোট্‌-ঠাকুমাকে প্রণাম করলেন, বাড়িতে সেদিন হুলুস্থুলু ব্যাপার।

দেশে থাকতে ঠাকুমার কাছে এক বিবাগী রাজপুত্রের গল্প শুনেছিলুম। ছোট্‌-ঠাকুর্দার গল্প দেখলুম তাকেও হার মানায়। গঙ্গার ঘাটে অবাঙালী একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তিনি ভাব জমিয়ে ফেলেছিলেন। তারা মুঙ্গেরের লোক। কলকাতার কালী-মন্দির দর্শন করে দেশে ফিরছিল। ছোট্‌-ঠাকুর্দা তাদের নৌকোয় উঠে মুঙ্গেরে চলে যান। কিন্তু তারা লোক মোটেই ভাল ছিল না। মুঙ্গেরে এক বিধবা জমিদার-গিন্নীর কাছে তারা তাঁকে বিক্রি করে দেয়। জমিদার-গিন্নী তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট ছিল না, শহরের উপরে বিরাট বাড়ি, অনেক টাকা-পয়সা, দাস-দাসীও অগুন্তি, তবু বছর খানেক যেতে-না-যেতেই ছোট্‌-ঠাকুর্দা নাকি হাঁফিয়ে উঠলেন। রোজ বিকেলে কষ্টহারিণী ঘাটে বেড়াতে যেতেন, সেইখানে এক সাধুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, সেই সাধু বলতেন, "বেটা, একটা খাঁচার থেকে যদি বেরিয়ে এসেছিস তো আর-এক খাঁচায় ঢুকলি কেন? চল্‌ আমি তোকে এমন জিনিসের খোঁজ

মিলিয়ে দেব যে, আর কখনও খাঁচার মধ্যে ফিরতে চাইবি না।" মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে পালিয়ে, শেষ রাত্তিরে সেই সাধুর সঙ্গে গঙ্গা পেরিয়ে আরও দূরে চলে গিয়েছিলেন তিনি, দীর্ঘদিন তীর্থে-তীর্থে ঘুরে-বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু তবু নাকি শান্তি পাননি। আবার যখন বাংলাদেশে ফিরলেন, তাঁর বয়স তখন বাইশ বছর। ত্রিবেণীতে ছিলেন, সেইখানে ছোট্-ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

"আমার বয়স তখন পনর," ছোট্-ঠাকুমা বলছিলেন, "আমি গরিব-ঘরের মেয়ে, বাবা আমার বিয়ে দিতে পারছিলেন না, সমাজে তাই নিয়ে নিন্দে হচ্ছিল, তা তোমাদের কাকা এসে কন্যাদায় থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন।"

বাবা বললেন, "তিনি তাঁর দাদার কথা আপনাদের জানাননি?"

"জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, তাঁর দাদা কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এক বইয়ের দোকানে চাকরি করেন। সেই দোকানের নাম বাঁড়ুজ্যে-কোম্পানি। আমি তাঁকে অনেক করে বলেছিলুম যে, আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলো, তা তিনি কিছুতেই রাজী হতেন না। বলতেন, 'দাদা আমার দেবতুল্য মানুষ, সেই মানুষকে যখন একবার কষ্ট দিয়েছি, তখন আর এই কালোমুখ তাঁকে দেখাব না। আর তা ছাড়া তাঁরও রোজগার খুব কম, বউসুদ্ধ এখন যদি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই তো তিনি কি আর আশ্রয় দেবেন না, তা নিশ্চয় দেবেন, কিন্তু অতে তাঁর কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।' "

"কেন, কাকা কোনও চাকরি-বাকরি করতেন না?"

"না, বাবা। তোমার কাকা বিয়ে করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংসারেও তাঁর মন বসেনি। ওই এক রকমের মানুষ থাকে, যারা বাইরে গিয়েও শান্তি পায় না, আবার ঘরে থাকলেও কষ্ট পায়।"

রাস্তার ধারের বারান্দায় আমরা বসে ছিলুম। সন্ধে হয়ে আসছিল। মা শাঁখ বাজালেন। মই ঘাড়ে একটা লোক এসে আমাদের গলির মোড়ের গ্যাসের বাতিটা জেবলে দিয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে অস্ফুট গলায় বাবা বললেন, "কাকা মারা গেছেন কবে?"

ছোট্-ঠাকুমা তার যা উত্তর দিলেন, তাতে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলুম। বাবাকে খুব সহজ গলায় তিনি বললেন, "তোমার কাকা মারা গেছেন বলে আমি জানি না।"

পরনে চুল-পেড়ে ধুতি, হাত দুখানা নিরাভরণ, শূন্য সিঁথি খাঁ খাঁ করছে। অবাক চোখে বাবা কিছুক্ষণ ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তাহলে?"

ছোট্-ঠাকুমা হাসলেন। "একটানা বারো বছর যার স্বামীর কোনও খোঁজ নেই, তাকে নাকি বিধবার সাজ নিতে হয়। তাই নিয়েছি।"

আমরা সবাই চুপ করে ছিলুম। খানিক বাদে ছোট্-ঠাকুমাই কথা বললেন। নিচু গলায়, যেন শুধু নিজেকে শুনিয়ে, তিনি বলতে লাগলেন, "মাঝে-মাঝেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যেতেন। কখনও ছ'মাসের জন্যে, কখনও এক বছরের জন্যে।

ফিরে এসে বলতেন, ঘরের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছিলুম, তাই একটু ঘুরে এলুম। ভেবেছিলুম, এবারেও তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু এলেন না। বারোটা বছরের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না। হাতের শাঁখা খুলে ফেললুম, মাথার সিঁদুর মুছে ফেললুম, ছেলেপুলে হয়নি, বাবাও সেই কবেই মারা গেছেন, একলা মানুষ একটা ভাঙাবাড়ি আগলে এতকাল বসে ছিলুম, কিন্তু আর পারলুম না, বাঁড়ুজ্যে কোম্পানির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে তোমাদের কাছে এসে পেঁৗছেছি, তোমরা তাঁর আপনজন, এই শেষ ক'টা দিন তোমাদের কাছেই আমি থাকব।"

ব্যস্ত হয়ে বাবা বললেন, "নিশ্চয় থাকবেন। এখানেও থাকতে পারেন, কিংবা যদি বলেন তো আমাদের দেশের বাড়িতেও পাঠিয়ে দিতে পারি। যেখানে আপনার ইচ্ছে।"

মা এসে বললেন, "এ-বেলা আপনার জন্যে খানকয় লুচি ভেজে দিই?"

ছোট্-ঠাকুমা বললেন, "না না, রাত্তিরে আমি কিছু খাই না। সক্কলের খাওয়া হোক, তারপর আমাকে এক টুকরো মিছরি আর এক গেলাস জল দিয়ে যেও।"

দোতলার একটা ঘরে থাকত দিদি আর ছোট-পিসি। তাদের খাট দুখানা জোড়া লাগিয়ে বড় করে বিছানা পাতা হল। ছোট্-ঠাকুমাও সেই ঘরে শোবেন। ছোট-কাকার ছবি তোলার বাতিক ছিল। পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে সক্কলকে নিয়ে তিনি একখানা ছবি তুলেছিলেন। পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা, ঠাকুর্দার কোলে আমি খুব ভারিক্কে কায়দায় বসে আছি, সামনের সতরঞ্চিতে দিদি আর ছোট-পিসি, বড়রা সবাই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। কলকাতায় ফিরে সেই ফোটোখানাকে বড় করে বাঁধানো হয়। দিদিদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। ছোট্-ঠাকুমা সেই ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "এই বুঝি ভাসুর ঠাকুর? এই বুঝি দিদি? এই বুঝি চন্দরের বউ?"

আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ছোট্-ঠাকুমার পাশে শুয়ে গল্প শুনি। কিন্তু "না না, কাকীমাকে এখন একটু ঘুমোতে দে" বলে মা আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে পিছন ফিরে বললেন, "দয়া, তোরাও ওঁকে আর বিরক্ত করিস না, কাল সকালে আবার গল্প শুনিস, এখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়।"

ভোরবেলায় কিন্তু ছোট্-ঠাকুমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। খানিক বাদে ধরা পড়ল যে, দেওয়াল থেকে সেই ছবিখানাও উধাও হয়ে গেছে। বড়কাকা ত্রিবেণীতে গেলেন, ছোট্-ঠাকুমার বাবার নাম করে, এর-ওর-তার কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে ভাঙাচোরা একটা বাড়ি শেষ পর্যন্ত খুঁজেও বার করলেন, কিন্তু সেই বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছিল, পাড়ার লোকেদের জিজ্ঞেস করতে তারা বলল, "ওঁরা তো অনেক কাল এখানে থাকেন না।"

মা বললেন, "কাকীমার ধারণা, কাকা এখনও বেঁচে আছেন।"

বাবা বললেন, "কেন যে এলেন, আর কেন যে গেলেন, কিছুই বুঝলুম না।"

মনে আছে, দিন কয়েক আমাদের বাড়িতে তখন শুধু ছোট্-ঠাকুমার কথাই হতো। সেই উত্তেজনা ক্রমে থিতিয়ে এল। তারপর এমন হল যে, ছোট্-ঠাকুমার নামও আর কেউ করে না। যেন পুকুরে একটা ঢিল পড়েছিল, ঢেউ উঠেছিল, সেই ঢেউ এখন আবার মিলিয়ে গেছে।

বড়-কাকা আবার নতুন করে ঢেউ তুললেন। কলেজ থেকে ফিরে একদিন মাকে তিনি বললেন, "বৌদি, কাল থেকে আর আমি কলেজে যাব না।"

অবাক হয়ে মা বললেন, "কেন রে?"

" বি. এ. পাশ করে কী হবে? ইংরেজের গোলামখানায় গিয়ে আমি চাকরি করতে পারব না।"

"তাহলে কী করবি?"

"গ্রামে ফিরে যাব। নিজের হাতে চাষবাস করব।"

মা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, "চারুর জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, না রে?"

বড়-কাকা রেগে উঠে বললেন, "হু ইজ চারু? গান্ধীজীকে জেলের মধ্যে আটকে রেখেছে, এখন আমি পরীক্ষার পড়া নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। দেশে যাব, তকলি কাটব, লাঙল ঠেলব, বাস।"

মা বললেন, "তা আমার উপরে রাগ ফলাচ্ছিস কেন, তোর দাদা বাড়ি ফিরুক, তারপর তাকে গিয়ে বল।"

বাবা কিন্তু সব শুনে বললেন, "ভালই তো। চন্দর তো কিছু অন্যায় কথা বলেনি। গান্ধীজী বলেছেন, ব্যাক টু ভিলেজ। তা ও যদি গ্রামে গিয়ে চাষবাস নিয়ে থাকতে চায় তো থাকুক না। সে তো কিছু খারাপ কাজ নয়।"

দেশে তখন লবণ-সত্যাগ্রহ চলছে। সেটা যে কী ব্যাপার, তা আমরা বুঝতে পারতুম না, তবে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বাবা যে-সব কথাবার্তা বলতেন, তার থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারতুম যে, তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন। বাবা বলতেন, "ইংরেজ এবারে মোক্ষম ঘা খেয়েছে। গোটা দেশটাকে তো জেলখানা বানিয়ে ছেড়েছে, কিন্তু এই করে আর বেশীদিন চলবে না।"

চারদিকে তখন খুব ধরপাকড় চলছিল। বড়-কাকা দেশের বাড়িতে রওনা হয়ে যাবার দিন কয়েক বাদে পুলিশ এসে বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। সকালে থানায় নিয়ে গিয়েছিল, সারাটা দিন আমরা সবাই বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলুম, রাত্তিরে বাড়ি ফিরে, হাতের লাঠিটাকে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বাবা বললেন, "জেল-খাটা ছেলেদের কলেজে ঢুকিয়েছি, আমার ওপরে তাই দারুণ রাগ। বলে যে, এসব ছেলেকে কলেজে ভর্তি করা চলবে না।"

অস্ফুট গলায় মা বললেন, "তুমি কী বললে?"

"বললুম যে, নিশ্চয় ভর্তি করব। জেল খাটলে কলেজে পড়া চলবে না, এমন কোনও আইন তো এখনও হয়নি। হলে আমাকে জানাবেন।"

বাবাকে আমি খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু কখনও পরতে দেখিনি। এবারে তিনি

খদ্দর নিয়ে আরও মেতে উঠলেন। যেদিন তাঁকে থানায় নিয়ে যায়, তার পরদিন যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলেন, তখন দেখি, তাঁর পিছনে একজন ঝাঁকামুটে। ঝাঁকার মধ্যে এক বস্তা তুলো আর চারটে চরকা।

মা বললেন, "এ কী ব্যাপার?"

বাবা বললেন, "নিজেদের কাপড় নিজেরাই বানিয়ে নেব।"

"তা চারটে চরকা কেন?"

"বাঃ, সবাই সুতো কাটতে হবে না? দুটো এনেছি তোমার আর আমার জন্যে; আর দুটো এনেছি রনো আর বিশ্বর জন্যে।"

হেসে ফেলে মা বললেন, "দয়া, জংুই আর অমুই বা বাদ থাকবে কেন, ওদের জন্যেও একটা করে নিয়ে এলে পারতে।"

সব ব্যাপারেই বাবার খুব উৎসাহ। তক্ষুনি তিনি চরকার উপরে তুলোর পাঁজ চড়িয়ে সুতো কাটতে বসে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা কিছুক্ষণ ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর বললেন, "খুব হয়েছে, এখন হাত-মুখ ধুয়ে অমুকে নিয়ে খেতে বসো। সুতো যা বেরুচ্ছে, তাতে হাতি বাঁধবার একটা কাছি হয়ত হলেও হতে পারে, কাপড় হবে না।"

আমরা যখন চরকা নিয়ে খুব মেতে আছি, সেই সময়ে একদিন সকাল বেলায় একটা মস্ত বড় মোটর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বসে ছিলেন। বাবা তাঁকে দেখতে পেয়েই একতলার বৈঠকখানা-ঘর থেকে ছুটে গিয়ে, গাড়ির দরজা খুলে বললেন, "আপনি হঠাৎ এদিকে?"

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "জোড়াগির্জের ওদিকে একটা কাজ ছিল, তা ফিরতি পথে ভাবলুম তোমাদের খবরটা একবার নিয়ে যাই।"

"একটু ভিতরে আসবেন না?"

"আজ আর সময় নেই, পরে একদিন আসব। তা তোমরা সবাই ভাল আছ তো?"

"হ্যাঁ।"

বাবার পিছন-পিছন আমিও রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। বুড়ো ভদ্রলোক আমার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কে?"

"আমার ছেলে।"

"এত রোগা কেন?"

"বড্ড ম্যালেরিয়ায় ভোগে। তাই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। অ্যাদ্দিন ও ঠাকুর্দার কাছে ছিল। এখন ভালই আছে।"

"লোকেশ্বরের খবর কী?"

বাবা একটু আমতা-আমতা করছেন দেখে ভদ্রলোক বললেন, "দাঁড়াও, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। বুড়োদের খবর বাচ্চারাই সবচাইতে ভাল রাখে।" বলে আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে বাবু, তোমার দাদু

কেমন আছেন?”

তার আগের দিনই ঠাকুর্দার কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলুম। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, হুইলের ছিপ ফেলে আমাদের পুকুর থেকে একটা মস্ত বড় মাছ ধরা হয়েছে। বর্ষায় আমাদের পুকুর তো প্রত্যেকবার ভেসে যায়, তাই এতবড় মাছ সাধারণত পাওয়া যায় না। এটা যে কী করে পাওয়া গেল, কে জানে। নিশ্চয় বাইরে থেকে পুকুরে এসে ঢুকেছিল। তারপর জল যখন কমে যায়, আর বেরিয়ে যেতে পারেনি।

বুড়ো ভদ্রলোককে সেই কথা জানাতে তিনি হেসে বললেন, “বটে?” তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে, “লোকেশ্বর দেখছি দিব্যি আছে। কলকাতায় আসতে চায়?”

“না।”

“কেন চাইবে, লোকেশ্বর তো কখনও উচ্চাশার ফাঁদে পড়েনি, শুধু একটু সচ্ছলতা আর শান্তি চেয়েছিল, তা সে-বস্তু যখন পেয়ে গেছে, তখন ও আর কোথাও যাবে না।”

গাড়ি চলে গেল। বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, “উনি কে, বাবা?”

বাবা বললেন, “ঈশান-কাকা। তোর ঠাকুর্দার বন্ধু।”

ঈশান-দাদু যেদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, তার দিন পনর বাদে আমরা বড়-কাকার একখানা চিঠি পাই। চিঠি পড়ে জানলুম, ঠাকুর্দার ইতিমধ্যে হঠাৎ খুব জ্বর হয়েছিল, বীরপুর থেকে ডাক্তার আনানো হয়েছিল। তাঁর ওষুধ খেয়ে জ্বর সেরেছে বটে, কিন্তু এখনও ঠিক সুস্থ হয়ে ওঠেননি। কিছু খেতে চান না, কথাবার্তাও বিশেষ বলেন না, সারাদিন শুধু চুপচাপ বসে বই পড়েন।

বাবা বললেন, “আমার একবার দেশে যেতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু বড়-দিনের ছুটির আগে তো আমি যেতে পারছি না।”

মা বললেন, “তা হলে?”

“এক কাজ করা যাক। রনোর এখন পড়াশুনোর বিশেষ চাপ নেই, অমুকেও সেই জানুয়ারির আগে ইশকুলে ভর্তি করা যাচ্ছে না। ওদের দুজনকে বরং পাঠিয়ে দাও।”

পরদিনই আমি মেজকাকার সঙ্গে শিয়ালদায় গিয়ে রেলগাড়িতে উঠলুম। বাবা ইস্টিশানে এসেছিলেন। গাড়ি ছাড়বার খানিক আগে ভাঁজ-করা একখানা মোটা খদ্দরের চাদর আমার হাতে দিয়ে বললেন, “তোর দাদুকে দিস। বলিস যে, নিজের হাতে সুতো কেটে বাবা এই চাদরখানা বানিয়ে দিয়েছে।”

॥ ১৪ ॥

আমরা যে এমন হঠাৎ এসে হাজির হব, বাড়িতে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। যেমন অবাক, তেমনি খুশী। সকালবেলায় জেলা-শহরে পেঁছই; সেখান থেকে মোটরগাড়িতে করে বীরপুরে এসে, খেয়া পার হয়ে তারপর হাঁটাপথে বাড়ি আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। ভরত-কাকাকে দিয়ে তক্ষুনি পুকুরে জাল ফেলিয়ে মাছ ধরা হল। বড়-কাকীমা উনুন ধরিয়ে ভাত বসিয়ে দিলেন। ঠাকুমা বললেন, "সকাল থিকা প্যাটে ভাত পড়ে নাই, অমুর মুখখান এক্কেরে শুকাইয়া গেছে।"

ঠাকুর্দা দেখলুম এই ক'মাসেই অনেক রোগা হয়ে গেছেন। কাছে বসিয়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "অমলাংশুবাবু, সমুদ্দুর কেমন দেখলে?"

"খুউব ভাল।"

"মন্দির দেখনি?"

"অনেক অনেক মন্দির দেখছি।"

"আর কী দেখলে?"

"অনেক বান্দর দেখলাম। এট্টা মস্তমইনা মুখপোড়া বান্দরও দেখছি, তার ল্যাজটা এক্কেরে দশ হাত লম্বা।"

"বাঁদর নয়, ওটা হনুমান। তা পড়াশুনোও একটু-একটু করছ তো?"

"বাবা কইছে যে, ভাংটা বছ্বরে আর ইশকুলে গিয়া কাম নাই। তাই ছোট্-কার কাছে পড়তে বসি।" তারপর একটু থেমে বললুম, "বানান ভুল করলে ছোট্কা খুব গাইলায়।"

ঠাকুর্দা হেসে ফেললেন। বললেন, "খুব অন্যায়, খুব অন্যায়, তোমার ছোট্কা তো বড়দিনের বন্ধের সময় বাড়ি আসবে, তখন তাকে আমি বকে দেব। তা কলকাতা থেকে হঠাৎ এইভাবে চলে এলে যে?"

"বাবা পাঠাইয়া দিল। কইল যে, এখন মাস কয় গিয়া দাদুর কাছে থাকো।"

"তোমার নিজের আসতে ইচ্ছে হতো না?"

"খুউব ইচ্ছা হইত।"

ঠাকুমা বললেন, "অমু, খাইতে আয়।"

রান্নাঘরের বারান্দায় ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছিল। মেজকা আর আমি খেতে বসলুম। খেতে খেতে মেজকা বললেন, "বাবার শরীর এখন কেমন আছে মা?"

ঠাকুমা বললেন. "ভাল না। খুব দুর্বল। মুখে রুচি নাই, পইথ্য দিলে সরাইয়া

রাখেন, সারাডা দিন চুপচাপ বইসা থাকেন, কারুর সঙ্গে কথাই কইতে চান না। আইজ তবু নাতিরে দেইখা মুখে এট্টু হাসি ফোটছে।"

মেঘু আর নেউল এসে ডাকাডাকি করছিল। জাগীর-দাদাকে নিয়ে বড়-কাকা হাটে গিয়েছিলেন। ঠাকুর্দার শরীর তো ভাল নয়, তাই বেলাবেলি তাঁরা ফিরে এলেন। বড়-কাকা বললেন, "কীরে তোরা কখন আইলি?" কিন্তু আমার আর সে-কথার উত্তর দেবার মতো সময় ছিল না। মুখ-হাত ধুয়ে, ঠাকুমার আঁচলে মুখ মুছে, মেঘু আর নেউলের সঙ্গে আমি পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম। পিছন থেকে বড়-কাকীমা বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরা আসিস।"

মহাদেবদা যে মারা গিয়েছেন, তা আমি জানতুম না। মেঘু বলল, "এক্কেরে রাজযক্ষ্মা হইছিল।" নেউলের কাছে শুনলুম, মহাদেবদার নতুন বউয়ের নাকি ছেলেপুলে হবে। যেন দারুণ একটা খবর দিচ্ছে, এইভাবে খুব গম্ভীর গলায় সে বলল, "বাবারে খেউরি করতে-করতে বিল্লস-দাদা সেইদিন কইতেছিল যে, যদি ছাওয়াল হয় তো তার মুখখান নাকি মানিক-দাদার মতন হইতে পারে।"

কথাটার অর্থ কী, আমি বুঝতে পারলুম না। একজনের মুখ তো আরেক-জনের মতন হতেই পারে, তাতে এত অবাক হবার কী আছে!

বরং ভুবন-দাদুর খবরটাই একেবারে হতভম্ভ হয়ে যাবার মতো। তিনি নাকি অন্ধ সেজে থাকেন, আসলে সবই দেখতে পান।

মেঘু বলল, "ওই পাড়ার তুলসী-দাদা একদিন ভুবন-দাদুরে ইস্তক একখান চিঠিও পড়তে দ্যাখছে। ঘরের মইধ্যে কুপি জ্বালাইয়া চিঠি পড়তে আছিল।"

নেউল বলল, "ফটিক-কাকাও সেইদিন কইতে আছিল যে, এইদিকে তো শুনি অন্ধ, ওইদিকে আবার গুঁতাগাতা না-খাইয়াই গোটা গেরাম চইষা বেড়ায়, বুড়া আসলে মহা পাজী।"

মেঘু আর নেউলের কাছে আর-একটা খবরও শোনা গেল। সামনের মাঘ মাসেই নাকি কালাদার সঙ্গে কাজল-দিদির বিয়ে হয়ে যাবে। "কাজল-দিদিরে তাই আর আইজকাল টিউকল থিকা জল আনতে পাঠায় না।"

মল্লিক-বাড়ির পাশ দিয়ে নিস্তার-বাগের দিকে যাবার সময় রাংচিতের বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, মহাদেবদার নতুন বউ বারান্দায় বসে কী যেন সেলাই করছে। মানিক-দাদাকে দেখতে পেলুম না।

দত্ত-পাড়ায় গিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে অনেক নাড়ু আর তক্তি খাওয়া হল। বড়-মিত্তিরবাড়িতে গিয়ে কাজল-দিদির সঙ্গে দেখা করলুম। কাজল-দিদি আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, "অমু, মাঘ মাসের আগে কিন্তু কইলকাতায় যাইস না।"

যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন সন্ধে উতরে গেছে। ঠাকুর-ঘরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছিল। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর শশার টুকরো আর বাতাসা খেয়ে মাথায় হাত মুছে, ভিতর-বাড়িতে এসে ঢুকেছি, বড়-ঘরের বারান্দা থেকে ঠাকুমা আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "ও অমু, একবার এইদিকে আয় তো।"

ঠাকুমা একটা লণ্ঠনের কাছে বসে খলের মধ্যে ওষুধ মাড়ছিলেন। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই খলটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "যা, তোর দাদুরে গিয়া এই মকরধ্বজটুক্ খাওয়াইয়া আয়।"

বড়-কাকীমা আমার নাম শুনে ইতিমধ্যে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেইখানে থেকেই হেসে বললেন, "বাবা আইজ খুব জব্দ, ওষুধের নাম শোনলেই এতদিন মুখ ফিরাইয়া নিছেন, কিন্তু অমু যদি ওষুধ নিয়া যায়, তাইলে আর 'না' করতে পারবেন না।"

ঠাকুর্দা সত্যি লক্ষ্মীছেলের মতো ওষুধ খেয়ে নিলেন। তারপর ঠাকুমার হাত থেকে জলের গেলাসটা নিয়ে বললেন, "ভাবছি আজ রাত্তিরেও দুটি ভাত খাব।"

বড়-কাকা আর মেজকা ওদিকে পুবের ঘরে বসে গল্প করছিলেন। খানিক বাদে লণ্ঠন হাতে আইনদ্দী-কাকাও এসে হাজির হল। বলল যে, লক্ষ্মীদিঘার ধান তো সব তুলে দেওয়া হয়েছে, একার দক্ষিণ মুল্লুক থেকে 'মলন'-এর লোকেরা গরু নিয়ে আসবে, তা আমরা যদি বলি তো আমাদের বাড়ির কাজই সবচাইতে আগে শুরু করা যায়।

গতবার মলনের সময় আমি দেশের বাড়িতেই ছিলুম। দক্ষিণের লোকেরা মস্ত মস্ত পাঁচটা বলদ নিয়ে এসেছিল। বাইরের উঠোনটাকে লেপেপুঁছে তকতকে করে রাখা হয়েছিল। সন্ধে নাগাদ মলন শুরু হল। আঁটি আঁটি ধান এনে, তার বাঁধন খুলে, উঠোনের উপরে পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া হল। উঠোনের মাঝখানে একটা খুঁটি পোতা। খুঁটির সঙ্গে বলদগুলোকে পর পর বেঁধে রাখা হয়েছে। গোল হয়ে তারা ধানের উপরে ঘুরতে লাগল। যে বলদটা খুঁটির সবচাইতে কাছে, তাকে 'মেইয়া' বলে, তাকেই সবচাইতে কম ঘুরতে হয়। আর সবচাইতে বেশী ঘুরতে হয় সবচাইতে দূরের বলদটাকে। ঘোরবার সময় পাছে ধান খেয়ে নেয়, তাই তাদের মুখে জাল পরানো। পুবের ঘরের পৈঠায় আমরা বসে ছিলুম। আমি, মেঘু, বনো-দিদি আর নিতাই-দাদা। দক্ষিণ দেশের লোকেদের কথা আমরা ভাল বুঝি না। মাঝেমাঝে নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছিল আর লাঠির ডগা দিয়ে ধানগুলোকে উল্টে দিচ্ছিল। ধানের আঁটির থেকে অনেক কুঁচ বেরিয়েছিল। আমরা সেই কুঁচগুলোকে মাঝে-মাঝে কুড়িয়ে আনছিলুম। ঠাকুমা এসে বললেন, "মলন তো এখন রাইত ভইরা চলবে। তোরা আর ঠাণ্ডা লাগাইস না। যা, এত্তিবেলা গিয়া শুইয়া পড়।" আমাদের কিন্তু উঠতে একদম ইচ্ছে করছিল না। মাথার উপরে মস্ত একটা চাঁদ। জ্যোৎস্না ফিনিক দিচ্ছে। চারদিক যেন দিনের মতো ফটফট করছে। বাতাসে শীতের আমেজ। কী ভালই যে লাগছিল।

এবারে আমাদের কাজ এখুনি শুরু করা যাচ্ছে না। আইনদ্দী-কাকার কথা শুনে বড়-কাকা বললেন, "কী রে রনো, মলনের জইন্যে লোক আনতে কইয়া দেব?"

মেজকা বললেন, "অখন থাক। বাবার শরীর তো খুব সুবিধার না। আর কয়ডা দিন দেখি।"

আইনদ্দী-কাকা চলে গেল। ঠাকুমা এসে বললেন, "তোরা খাইতে আয়।"

এক সঙ্গে সবাই খেতে বসলুম। ঠাকুর্দা আমাকে তাঁর পাতে বসিয়ে ঠিক সেই আগেকার মতো দুধভাত খাইয়ে দিলেন। ঠাকুমা বললেন, "অমু আসায় তোমার শরীর দেখি আদ্ধেক সাইরা গেছে।" ঠাকুর্দা তাতে হাসলেন। কিন্তু কোনও কথা বললেন না।

খাওয়ার পরে বললেন, "জাগীরকে বলো, একটু তামাক সেজে দিক।"

জাগীর-দাদা এসে তামাক সেজে দিল। বাবার পাঠানো মোটা চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে ঠাকুর্দা তাঁর খাটের উপরে আরাম করে বসে গুড়ুক-গুড়ুক করে তামাক খেতে লাগলেন।

তার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ঠাকুর্দা মারা যান।

বিছানা থেকে নেমে চটির মধ্যে পা গলাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, জাগীর-দাদা তাঁকে ধরে ফেলে ফের বিছানায় শুইয়ে দেয়। এ হল সকালবেলার ঘটনা, দুপুরে তাঁর ধুম জ্বর এল। মেজকা গিয়ে বীরপুর থেকে ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন যে, জ্বরের জন্যে চিন্তা করবার কিছু নেই, তবে হার্টের অবস্থা খুব খারাপ, লক্ষণ তিনি ভাল বুঝছেন না। কেউ তাঁর সঙ্গে বীরপুরে চলুক, সেখান থেকে তিনি দরকারী আরও-কিছু ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন।

বড়-কাকা বললেন, "রনো, তোর আর এখন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বীরপুরে গিয়ে কাম নাই। বরং আইনদ্দী যাক। যা যা ওষুধ আনবার, তা আইনদ্দীই নিয়া আসতে পারবে। সেই সঙ্গে বড়-ডাকঘর থিকা দাদারে এট্টা টেলিগ্রামও পাঠাইয়া দিয়া আসুক।"

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আইনদ্দী-কাকা বীরপুরে রওনা হয়ে গেল। তখন সন্ধে উতরে গেছে। চুপ করে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে ছিলুম। ঠাকুমা মাঝে-মাঝে ঠাকুর্দার কপালের জলপটি পালটে দিচ্ছিলেন। মেজকা একবার কাঁথাটা অল্প-একটু সরিয়ে ঠাকুর্দার গায়ের উপরে হাত রাখলেন। তারপর বড়-কাকীমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, "গা য্যান্ পুইড়া যাইতেছে।"

অত জ্বরের মধ্যেও ঠাকুর্দা কিন্তু হাসছিলেন। আমাকে একবার ইশারা করে কাছে ডাকলেন। বললেন, "দাদু, অমন শুকনো-মুখে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সেরে উঠি, তারপর দুজনে খুব গল্প করব।"

আইনদ্দী-কাকা মাঝরাত্তিরে বীরপুর থেকে ফিরল। মেজকা তার হাত থেকে ওষুধপত্তর বুঝে নিলেন। তারপর একটা শিশি থেকে কাচের পেয়ালায় এক-দাগ ওষুধ ঢেলে ঠাকুমাকে বললেন, "মা, দ্যাখো তো বাবারে এই ওষুধটা খাওয়াইয়া দিতে পারো কিনা।"

ঠাকুর্দা তখন ভুল বকছিলেন। বিড়-বিড় করে বলছিলেন "দক্ষিণ-খোলা বাড়ি ...পুবদিকে পুকুর...পুকুরের পাড়ে পেয়ারা গাছ...সর্ব...আঃ, সর্ব কোথায়

গেল...”

বড়-কাকা বললেন, “আমাগো এই বাড়ির কথা কইতেছেন।”

ঠাকুমা চুপচাপ ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। চোখ না তুলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, “না, এই বাড়ির কথা না। মানকরের বাড়ির কথা। উনি তো সেই বাড়ির কথা কাউরে কিছু কইতে চাইতেন না, কিন্তু তা না কইলেও আমি সব বুঝতে পারি; আমি জানি যে, সেই বাড়িও দক্ষিণ-খোলা আছিল, সেই বাড়িরও পুবদিকে পুকুর আছিল...পুকুরের পাড়ে এট্টা পেয়ারা-গাছও আছিল।”

শেষ-রাত্তিরে ঠাকুর্দার জ্বর হুহু করে নেমে যেতে থাকে। মৃত্যুর আগে তাঁর জ্ঞানও পুরোপুরি ফিরে এসেছিল। তখনও কাক ডাকেনি, কিন্তু পুব-আকাশের অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এসেছে। ঠাকুমার দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন; তারপর বললেন, “তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ বুঝি? কই, আমার তো কোনও কষ্ট নেই।”

॥ ১৫ ॥

সোমবার দিন ভোরবেলায় ঠাকুর্দা মারা যান। তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন, বাড়ির দক্ষিণ-দিককার ভিটেয় যেন তাঁকে দাহ করা হয়। বিকেলে সেই ভিটের উপরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। চিতা থেকে একটু দূরে, জাগীর-দাদার কোলের মধ্যে, আমি বসে ছিলুম। দেখছিলুম, রাশি-রাশি কালো ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

বাবা সবাইকে নিয়ে তার পরদিন দুপুরে এসে পেঁাছলেন। কাকাদের দেখাদেখি আমিও আমার গলায় একটা ন্যাকড়ার ফালি ঝুলিয়ে তাতে একটা চাবি বেঁধে নিয়েছিলুম। মালসা পুড়িয়ে ঠাকুমা আমাদের জন্যে ভাতে-ভাত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কাককে না-খাইয়ে তো আমরা কিছু খেতে পারব না, তাই তার থেকে একমুঠো ভাত একটা সরায় তুলে নিয়ে আমি তখন কাকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবা আসছেন শুনে সেই অবস্থাতেই আমি পুকুর-পাড়ে ছুটে যাই। ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি। মাও খুব কাঁদছিলেন। দিদি আর ছোট-পিসি তাঁর আঁচল ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবা এসে পেঁাছবার পর বাড়িতে আবার কান্নার রোল পড়ে যায়। একমাত্র ঠাকুমাই কাঁদছিলেন না। সকলকে তিনি শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। বলছিলেন, "তিনি ভাল গেছেন। তিনি খুব পুণ্যবান মানুষ। তিনি কোনও কষ্ট পান নাই। তাঁর জইন্যে তোমরা দুঃখ কইরো না। এমন যাওয়া কয়জন যাইতে পারে? এই যাওয়া খুব ভাল যাওয়া। এই যাওয়া খুব সুখের যাওয়া।"

কাজের বাড়িতে শোক করবার সময় মেলে না। ক্রমাগত লোক আসছে, আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিতে হচ্ছে, জিনিসপত্রের ফর্দ করা হচ্ছে, চিঠি লিখতে হচ্ছে, এ-বেলা ও-বেলা বীরপুরের গঞ্জে লোক পাঠাতে হচ্ছে—ক'টা দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল, বোঝাই গেল না।

শ্রাদ্ধের দিন সকাল থেকেই বাড়িতে ভীষণ ভিড়। ভীষণ চেঁচামেচি। হিজলকান্দার ছুতোর মিস্ত্রী এসে একটা বৃষকাষ্ঠ বানিয়ে দিয়েছিল। বাইরের উঠোনের একদিকে একটা সামিয়ানা খাটিয়ে তার তলায় দান-সামগ্রী সাজিয়ে দেওয়া হল। অন্যদিকে শ্রাদ্ধের আসর। পুরুতমশাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়াচ্ছিলেন: "মধু বাতা—ঋতায়তে—মধু ক্ষরন্তি—সিন্ধবঃ।" শ্রাদ্ধ শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। পংক্তিভোজনের পাট চুকতে চুকতে প্রায় সন্ধে। তারপর এক সময় দেখলুম, আত্মীয়স্বজন অভ্যাগতেরা একে-একে বিদায় নিচ্ছেন। বাড়ি

আবার শান্ত হয়ে এল।

তার দিন-তিনেক বাদেই মা, ছোট-পিসি, দিদি, মেজকা আর ছোটকা কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন। বাবা বললেন, "তোমরা রওনা হয়ে যাও। ক'দিন বাদেই তো দয়া আর জুঁইয়ের পরীক্ষা, আর ওদের ইশকুল-কামাই করা ঠিক হবে না। আমি বরং আরও কয়েকটা দিন থাকি। বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর রওনা হব।"

সেইদিন রাত্তিরে সবাই খেতে বসেছি। বড়-কাকীমা মস্ত একটা ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছেন। পাছে বেরাল আমাদের পাতে মুখ দেয়, তাই ঠাকুমা একটা পাটকাঠি হাতে নিয়ে আমাদের সামনে বসে আছেন। খেতে-খেতে বাবা বললেন, "চন্দর, চাষবাস তোর কেমন লাগছে?"

বড়-কাকা কোনও উত্তর দিলেন না। তখন বাবা বললেন, "ভাল না লাগলেও তো উপায় নেই। লক্ষ্মীদিঘার মলন এখনও বাকী। কিছুদিন বাদেই আবার আমন-ধান উঠবে; তারও একটা দেখাশোনার ব্যাপার আছে। জাগীর-কাকা একা এতসব পেরে উঠবে না। তুই এখন কিছুদিন এখানেই থাক। নইলে বাবা যে এত যত্ন করে এত সব করলেন, এ-সব নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবছি, রনোর তো পড়াশুনোয় বিশেষ মন বসল না, মাস কয়েক বাদে বরং তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে তোকে আর বউমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব।"

ঠাকুমা বললেন, "চাষবাসের কাজকর্ম রনো খুব ভালই বোঝে। তা ছাড়া আইনদ্দী যখন আছে, তখন আর ভাবনা কী, বুক দিয়া ও সবকিছু আগলাইয়া রাখবে, রনোর গায়ে ও এট্টা আঁচড় পর্যন্ত লাগবার দেবে না। কিন্তু ইন্দ্র, আমি তো সেই কথা ভাবি না, আমি অন্য কথা ভাবি। চারু যদি কইলকাতায় চইলা যায় তো এইখানে ঘরের কাজকর্ম দ্যাখবে কেডা?"

বাবা বললেন, "রনোর বয়সও তো বছর-কুড়ি হল। তা সামনের বছর ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "মা, তুমিও আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো না।"

ঠাকুমা বললেন, "না বাবা, আমার কোথাও যাইতে ইচ্ছা নাই। যে-কয়ডা বছর বাইচা আছি, এইখানেই থাকব।"

"কিন্তু তুমি না-গেলে অমুই কি আর যেতে চাইবে?"

আমি কোনও কথা বললুম না। খেতে খেতে মুখ তুলে, আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "থাক্, কলকাতায় তো তোর শরীর টেকে না, এখানে তোর ঠাকুমার কাছে তুই ভালই থাকবি।"

মধ্যের বাড়ির মেজো-জ্যাঠামশাই এসে পঞ্জিকা দেখে বলে গিয়েছিলেন যে, বাবার যেদিন কলকাতায় রওনা হবার কথা, যাত্রার পক্ষে সেই দিনটা ভাল নয়,

তাই তার আগের দিনই "যাত্রা" করে, বড়ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, বাবা গিয়ে কাছারি-ঘরে শুয়ে ছিলেন। তাতে নাকি দোষ খণ্ডে যায়।

আমি শুয়েছিলুম ঠাকুমার কাছে। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। তার মৃদু আলোয় আমি দেখতে পাচ্ছিলুম যে, ঠাকুর্দার খাটটা একেবারে খাঁখাঁ করছে। এই ক'দিন আমি একদম কাঁদিনি, কিন্তু সেদিন আমার চোখে আবার সেই আগের মতো জল এসে যাচ্ছিল। ঠাকুমা বুঝতে পারছিলেন যে, আমি কাঁদছি। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, "কীরে, তুই কাঁদিস ক্যান্?" আমি চুপ করে ছিলুম। কী জানি কেন, ঠাকুমার কাছে শুয়েও সেদিন নিজেকে ভীষণ একা-একা লাগছিল। ঘুম আসছিল না।

মনে আছে, কাক ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলুম; কাছারি-ঘরে ছুটে গিয়ে বাবার ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিলুম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

বাবা কিন্তু একদম অবাক হলেন না। শুধু বললেন, "তা হলে তুইও কাল রাত্তিরে যাত্রা করে কাছারি-ঘরে এসে শুলি না কেন?"

আমি কোনও উত্তর দিলুম না। তখন বাবাই আবার হেসে বললেন, "ঠিক আছে, আমি তো যাত্রা করেছি, তাতেই তোর দোষ খণ্ডে যাবে।"

ঠাকুমা সব শুনে বললেন, "দাদু নাই, তাই অমুরও এইখানে আর মন টিকতেছে না।"

আমি আর ভিতর-বাড়িতে গেলুম না। বড়-কাকা আমার ইজের-জামা-জুতো এনে কাছারি-ঘরে পেঁছে দিলেন। আমার একটা 'পাসিং শো'-মার্কা টিনের বাক্স ছিল। তার মধ্যে আমার সেলেট, পেনসিল, ধারাপাত, বাল্যশিক্ষা, গুল্‌তি আর কাঁচের গুলি থাকত। সেটাও তিনি দিয়ে গেলেন।

ঠিক ছিল, সূর্য উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়া হবে। কিন্তু ঠাকুমা আমাকে ফ্যানাভাত না খাইয়ে রওনা হতে দিলেন না। খবর পেয়ে মেঘু আর নেউলও ছুটে এসেছিল। মেঘু বলল, "মাঘমাসে কাজল-দিদির বিয়া। তখন আসিস কিন্তু।"

বড়-কাকীমা সারাক্ষণ চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিলেন। ভরত-কাকা আমাদের মালপত্র মাথায় তুলে নিল। সে আমাদের বীরপুর পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসবে। জাগীর-দাদা এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবা তাকে বললেন, "তোমাকে আর কী বলব. বাচ্চা বয়েস থেকে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ছিলে, তোমাকে ছাড়া তাঁর এক মিনিটও চলত না, তোমার শোকই সবচাইতে বেশী। কিন্তু কী আর করবে, মা রইলেন, চন্দর আর বউমা রইল, আর তো কিছু বলবার নেই, সবাইকে তুমি দেখো!"

জাগীর-দাদা শূন্য চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল।

খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে আমরা দোয়ালের মধ্যে নামলুম। দোয়াল

পেরিয়ে আলিকান্দা গ্রাম। গ্রামের ওদিকে খাল। খালের ধারে পেঁছে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম। দেখতে পেয়েছিলুম, তখনও আমাদের পুকুর-পাড়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

খাল পেরিয়ে মাঠ। লক্ষ্মীদিঘার ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। মাঠের উপরে হিমে-ভেজা নাড়া পড়ে আছে। এখনও তুলে নেওয়া হয়নি। মাঝে-মাঝে এক-একটা জায়গা একটু উঁচু। আমি জানি যে, নাড়া সরালেই ওখানে কচ্ছপ পাওয়া যাবে। মেঘু আর নেউলের সঙ্গে গত বছরও নাড়া সরিয়ে কত কচ্ছপ ধরেছি।

দেখতে দেখতে নদীর ধারে এসে গেলুম। কাঠের থল-এ করাত দিয়ে কাঠ চেরা হচ্ছিল। পাশে একটা বটগাছ। তার তলাটা ঢিপির মতো। ঢিপির গায়ে এখানে-ওখানে গোটাকয়েক গর্ত। আইনদ্দী-কাকা একবার বলেছিল যে, ওই গর্তের মধ্যে শজারু থাকে।

হঠাৎ একটা পুরনো কথা আমার মনে পড়ল। বাবাকে বলতে হবে। কিন্তু বাবা তো খুব তাড়াতাড়ি হাঁটেন, তাই এরই মধ্যে তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন। দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললুম। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম, "বাবা, বলো তো 'শল্লকী'র মানে কী।"

বাবা আমাকে কোলে তুলে নিলেন। হেসে বললেন, "শল্লকী মানে শজারু। কিন্তু তুই এ-সব শক্ত কথা কোথায় শিখলি?"

আমি কিছু বললুম না। কুয়াশা কেটে গিয়ে নদীর উপরে রোদ্দুর পড়েছে। ঢেউগুলো চিক-চিক করছে। সামনেই বীরপুরের খেয়াঘাট। বাবার হাত ধরে খেয়া-নৌকোয় উঠলুম। এবার ও-পারে যাব।